রূপকথা

বাংলা ও বাঙালির কথা বলে

তৃতীয় বর্ষ
উৎসব
সংখ্যা
২০২৩

সম্পাদক

মানস কুমার ঠাকুর

NMDC
The Earth is our Workplace.
We Preserve and Protect it.
(Going Green since 1958)
More than 6 decades of Responsible Mining and Sustainability
> One of the best performing Public Sector Enterprises of India
> The single largest producer of iron ore in the country
> Sole producer of Diamonds in India
> All Projects are accredited with IMS Standards comprising of ISO 9001 2015, ISO 14001 2015, ISO 45001 2018, and SA 8000 2014
> Internal Safety Audits conducted routinely for ensuring Safety in Mines and Plants
> Bringing socio-economic tansformation through innovative and impactful CSR initiatives in the less developed regions of the country
NMDC re-dedicates itself with a fresh zeal and renewed enthusiasm, energy and strategy to achieve greater heights in delivering value for all its stakeholders.
NMDC Limited
(A Government of India Enterprise)
www.nmdc.co.in
Responsible Mining

তৃতীয় বর্ষ শারদ সংখ্যা ২০২৩

রূপকথা

বাংলা ও বাঙালির কথা বলে

প্রধান সম্পাদক
মানসকুমার ঠাকুর

নির্বাহী সম্পাদক
সৈকত হালদার

সহ-সম্পাদক
ঈপ্সিতা সেন

সহযোগী
মধুমিতা দাস

অক্ষরবিন্যাস
দেবাশিস নায়েক

প্রচ্ছদের ছবি
মধুমিতা

পরিচালনা
মানসী রিসার্চ ফাউন্ডেশন
www.manasiresearch.org

মুদ্রক
রোহিনী নন্দন
১৯/২, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা - ৭০০০১২
www.rohininandan.com
দাম - ১০০ টাকা

সূচিপত্র

ধর্মের কথা :	৪ - ৯
ব্যক্তিত্ব :	১০ - ২৬
বিশেষ রচনা :	২৭ - ৩৬
কবিতা :	৩৭ - ৪৭
ছোটো গল্প :	৪৮ - ৫৪
কলকাতার গর্ব :	৫৫ - ৫৬
বিশেষ নিবন্ধ :	৫৭
শতবর্ষে স্মরণ :	৫৮ - ৫৯
সংস্কৃতি :	৬০
নস্টালজিয়া	৬১ - ৬৩
মুখোমুখি :	৬৪ - ৬৯
ভ্রমণ :	৭০ - ৭২
খানাপিনা :	৭৩ - ৭৫
উদ্যোগ :	৭৬ - ৭৯
সঙ্গীত	৮০ - ৮২
শিক্ষা :	৮৩ - ৮৫
হারানো মানুষ :	৮৬ - ৮৯
সিনেমা :	৯০ - ৯৪
সিরিয়াল :	৯৫
রূপচর্চা :	৯৬-৯৮
অন্যরচনা:	৯৯
খেলা :	১০০-১০২

সম্পাদকীয় —

দেবীর আগমনে থেমে যাক সকল অস্থিরতা

চারদিকে এক অস্থিরময় পরিস্থিতি। বন্যা, ধস, রোগ, রাজনৈতিক হিংসা, মারামারি, হানাহানির আবহে যেন এক টালমাটাল অবস্থা। এই অস্থির সময় থেকে উদ্ধারের জন্য যখন চারদিকে আর্ত রব উঠেছে ঠিক তখনই এই ধরাধামে আবির্ভূত হচ্ছেন মা দশভূজা। যিনি যুগের পর যুগ ধরে পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। যাঁর কাছে এই মানবকুলের প্রার্থনা—

‘হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাসুখম্।
হর রোগং হর ক্ষোভং হর মারীং হরপ্রিয়ে।।’

মা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, তিনিই অভয়াদাত্রী আবার তিনিই বাড়ির মেয়ে উমা। তার আগমনের বার্তাতেই কেটে যায় সব ঝঞ্ঝা, থেমে যায় সব অস্থিরতা। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে উৎসবের আবহ। নিম্নচাপের ঘন মেঘ কেটে উঁকি দেয় ঝলমলে মন ভালো করা রোদ্দুর। শারদোৎসব মানেই হুল্লোড়, আড্ডা, খাওয়াদাওয়া আর ছোটোবেলার স্মৃতিচারণ। আরো একটি বিষয় পুজো আসলেই মনে পড়ে। পুজোসংখ্যা। বাঙালির একান্ত নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা। বাঙালির কাছে পুজোসংখ্যার পাতা উলটে দেখা যেন এক আবেগ, উত্তেজনা। আজকের দিনে যতই যুগ বদলে ডিজিটাল মাধ্যম আসুক। নতুন পুজোসংখ্যা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে না দেখলে যেন মনের শান্তি, চোখের আরাম মেলে না। তাই প্রতি বছরের মতো এবারও ‘রূপকথা’ পুজোসংখ্যা প্রকাশ করতে চলেছে। পাঠকের মন ছুঁয়ে যাবে রাখা হয়েছে এমন একাধিক বিষয়। রয়েছে সাহিত্যধর্মী লেখার পাশাপাশি ধর্ম, বিশেষ ব্যক্তিত্ব, বিশেষ রচনা, ব্যবসা, শিক্ষা, বিনোদন, ভ্রমণ, খাওয়াদাওয়া, খেলার মতো নানা বিষয়। আশা রাখছি এই সংখ্যা পাঠকের চাহিদা মেটাতে পারবে। আমাদের লক্ষ্য হল, বাংলা ও বাঙালির চিরন্তন সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে তুলে ধরা। তবে পাঠকই শেষ কথা বলবেন। তাঁদের দেখানো পথেই আমরা নতুন দিশা খুঁজে পাব। সকলকে জানাই শারদ শুভেচ্ছা। পুজোর দিনগুলো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

ধর্মকথা—

যুবসমাজকে ত্যাগের মাধ্যমে মানুষের সেবায় ব্রতী হতে হবে

স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ, সাধারণ সম্পাদক, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

যুগ যুগ ধরে মা দুর্গাকে আমরা জগৎজননী রূপে আরাধনা করে আসছি। মা আমাদের কাছে দুর্গতিনাশিনী। তাঁর আগমনকে ঘিরে আকাশে-বাতাসে আগমনীর সুর শোনা যায়। এক অনির্বচনীয় আনন্দে আমাদের মন ভরে যায়। সন্তানরা সারা বছর পুজোর এই ৪টি দিনের অপেক্ষায় থাকেন। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই পুজোর আনন্দে মেতে ওঠেন। আমরা সবাই মা দুর্গার আশীর্বাদ কামনা ও প্রার্থনা করি। মা দুর্গাকে পুরাণে নানারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। দেবী দুর্গাকে আমরা শক্তিরূপে আরাধনা করি। চণ্ডীতে বলা হয়েছে- ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা/ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সব জীব-জড়ে তাঁর অবস্থান। তিনি সব শক্তির আধার। দশভূজা মা দুর্গার দশ হাতে নানা অস্ত্র যেমন রয়েছে, তেমনি আবার তিনি সন্তানদের হাত দিয়ে বরাভয়- আশীর্বাদ করছেন। মহিষাসুরমর্দিনীর যে অসুর বধের ছবি আমরা দেখি- ওই অসুর আসলে আমাদের মনের কামনা-বাসনা-লোভ। সব কিছু থেকে মুক্ত করতে মা দুর্গা ধরণীতে আবির্ভূতা হন। তাঁর আবাহনে আমরা মেতে উঠি।

বাঙালি হিন্দুদের কাছে দুর্গাপুজো সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব। এখন চারদিকে ধর্মের নামে অপব্যাখা বা ভুল ব্যাখা চলছে। তাতে ধর্ম নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াছে। ধর্ম নিয়ে যথার্থ চর্চা বা না জেনে এই ধরনের অপব্যাখা চলছে। ধর্ম আসলে কী? ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের মতে, ধর্ম হল ত্যাগ, সংযম, সত্য ও ব্রহ্মচর্য। ধর্ম হল, ব্যক্তিস্বার্থ উপেক্ষা করে ত্যাগের মাধ্যমে মানুষের সেবা করা। আর এই লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ আর্তের সেবায় কাজ করে চলেছে। ধর্ম সত্যের পথে চলতে শেখায়। মনুষ্যত্বের পথ দেখায়। ধ্যান, প্রাণায়াম, আত্মনিয়ন্ত্রণের উপায় শেখায়। কিন্তু এসবের

ব্যবহারিক প্রয়োগ দরকার। যা অনুশীলনের মাধ্যমে সম্ভব। বিদেশে ধ্যান, প্রাণায়াম প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তর চর্চা ও গবেষণা চলছে। যুবসমাজকে ব্যক্তি স্বার্থ ত্যাগ করে বৃহত্তর সমাজের কথা ভাবতে হবে। মানুষের সেবায় ব্রতী হতে হবে। ত্যাগের মধ্যে দিয়ে মুক্তির খোঁজ পাওয়া যায়।

"সঙ্কল্পে যে দৃঢ়, প্রতিজ্ঞায় যে অবিচলিত, যাবতীয় সিদ্ধি তার করতলগত। সঙ্কল্প ছাড়িব না, প্রতিজ্ঞা ভাঙিব না, এই সার নীতি যার, সেই একমাত্র বিশ্বজয়ী হইতে পারে।"

ধর্মকথা—

যুগল পিরীতি কেমন

রাধাবিনোদিনী বিন্তি বণিক

তখন শ্রীরাধারানির পূর্বরাগ দশা চলছে। দেবী পৌর্ণমাসীর অভিলাষ হল রাধারানির প্রেমকে একবার পরীক্ষা করার। তাই তিনি বললেন, "ওহে রাধে! শোনো! এই যে তুমি মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা করছো, স্বপ্ন দেখছো (!)---তোমার এই বাসনা কোনওদিনই চরিতার্থ হবে না। স্বপ্নপূরণ সম্ভব নয় কোনমতেই। কারণ, তিনি তো মহাঐশ্বর্যময়ী শ্রীকমলার হৃদয়লালিত ধন! শ্রীলক্ষ্মীর সাধনার সম্পদ! আর তুমি অতি সাধারণা। এক গোপিনী হয়ে কিনা সেই শ্রীকমলা-বাঞ্ছিত বস্তুকে নিজ বল্লভ বানাতে চাইছ! এ তো অসম্ভব,অবাস্তব ব্যাপার! তাই তাঁকে বরং ভুলে যাও। তাঁর প্রতি অনুরাগ ত্যাগ কর। এতেই তোমার মঙ্গল জানবে।" দেবী পৌর্ণমাসীর কথাকে ব্রজে সকলেই খুব মান্যতা দেয়, সম্মান করে। তাই রাধারানি বললেন, 'হে দেবী, তোমার কথা তো সর্বজনগ্রাহ্য, সর্বত্র শিরোধার্য। আমাকেও তাই তোমার কথা শুনতে হবে বৈকি! তুমি যে বলছো কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করতে---আমি তাই করবো।" পৌর্ণমাসী দেবী শুনে বললেন, "যাক বাঁচা গেল। ভালো হল।"

রাধারানি বললেন তৎক্ষণাৎ, "না, না বাঁচা গেল না! তোমার একটা আশীর্বাদের বিনিময়ে আমি এই অনুরাগ বর্জন করলাম।" দেবী পৌর্ণমাসী শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "একটা আশীর্বাদের কী কথা (!), আমি তোমায় একশোটা আশীর্বাদ করছি। তুমি সতী-সাধ্বী রমণীকুলের শিরোমণি হও। সৌন্দর্য, মাধুর্যের ধূর্য হও। সর্ব গুণে গুণান্বিতা হও। অতুলনীয় ঐশ্বর্যের অধিকারিনী হও। চিরতরে ধন্যা হয়ে শতায়ু হয়ে বেঁচে থাকো।" রাধারানি--- "না, না তুমি তো তোমার ইচ্ছে অনুযায়ী আশীর্বাদ দিয়ে চলেছ! নিজের মর্জি মতোই যা মনে হয় বলে চলেছ! আমার এত আশীর্বাদের প্রয়োজন নেই। কেবল একটি আশীর্বাদই যথেষ্ট।

পৌর্ণমাসী----- "বেশ তো, কী চাও শুনি!"

তখন রাধারানি বললেন, "আমায় তুমি এই আশীর্বাদ দাও যেন এখনই এই মুহূর্তেই মরে যাই আমি!" পৌর্ণমাসী বললেন, "বা রে! এ আবার কেমন আশীর্বাদ! মরার আশীর্বাদ কেউ চায় নাকি! এ তো অভিশাপ দেওয়া হয়ে যাবে। লোকে তো

আমায় নিন্দা করবে এই আশীর্বাদ দিলে!"

রাধারানি বলে চলেছেন-- "হ্যাঁ, আমি এক্ষুনি মরে যেতে চাই আর মরে গিয়ে ভৃঙ্গীর (স্ত্রী ভ্রমর) জন্মপ্রাপ্ত হতে চাই। এই আমায় আশীর্বাদ করো।"

পৌর্ণমাসী দেবী মনে মনে হাসছেন আর শ্রীরাধার প্রেমের রঙ্গ দেখছেন; অবাক হয়ে বললেন--- "কেন কী হবে ভৃঙ্গীর জন্মপ্রাপ্ত হয়ে, শুনি?

শ্রীরাধা বললেন, "যখন শ্যামসুন্দর গোচারণ করে ফেরেন তখন গোপসখারা বনফুল তুলে মালা গেঁথে তাঁকে যে মালা পড়িয়ে দেয় সেই মালা তাঁর কণ্ঠে দোদুল্যমান থাকে। আর তিনি তো তাঁর সখাদের সাথে হেসে হেসে কথা বলতে বলতে ফেরেন, তখন তাঁর মুখসুবাস সেই মালায় লেগে মিশে যায়। আমি ভৃঙ্গী হয়ে সেই মালায় বসে তাঁর সেই মুখসুবাস আস্বাদন করব। শ্রীকৃষ্ণের দেহে আটটি কমল থাকে। দুটি হস্তকমল, দুটি পদকমল, দুটি নেত্রকমল, একটি নাভিকমল ও একটি বদনকমল। কেবল মালার সৌরভ বা মধুর আকর্ষণে তো ভৃঙ্গ-ভৃঙ্গীরা আসে না। শ্যামসুন্দরের ওই আটটি কমলের সৌরভ, মধুরিমাদি আস্বাদন করতে তাদের আগমন হয়। এই মনুষ্য দেহ দ্বারা যদি শ্যামসুন্দরকে ভালোবাসতেই না পারি, তাঁকে অনুরাগপূর্ণ অন্তরে আলিঙ্গন না করতে পারি, তাঁর সেবায় যদি না লাগে সর্বাঙ্গ আমার, তবে এ দেহ থেকে কী লাভ! তার থেকে বরং মরে যাই। মরে গিয়ে ভৃঙ্গীদেহ গ্রহণ

করি। ক্ষণকালের জন্য হলেও তো ভৃঙ্গী হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন করতে পারবো ! এ কারণে তুমি ভৃঙ্গী হওয়ার আশীর্বাদ প্রদান কর আমায়।"

দেবী পৌর্ণমাসী মুগ্ধ হয়ে গেলেন শ্রীরাধার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমানুরাগ উপলব্ধি করে। তিনি বেশ অনুভব করলেন এই পূর্বরাগের প্রেম যেমন তেমন প্রেম নয়, সাক্ষাৎ মহাভাবময়ীর প্রেম----

কবি বিদ্যাপতি শ্রীরাধার প্রেমের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখলেন----

"অনুক্ষণ মাধব মাধব সোঙারিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই ।
ও নিজভাব স্বভাব হি বিছুরল আপন গুণ সুবধায়।।"

অর্থাৎ, অনুক্ষণ বা প্রতিমুহূর্তে মাধবের কথা ভাবতে ভাবতে সুন্দরী অর্থাৎ শ্রীরাধা যেন নিজেই মাধবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর নিজ স্বভাব সরে গিয়ে মাধবের স্বভাব প্রকাশ হচ্ছে। মাধবের অন্তরের ভাব এখন তাঁর অন্তরে। মাধবের আচরণ তাঁর দ্বারা আচরিত হচ্ছে। তাইতো কখনো দুটি হাত শ্রীমুখের কাছে ধরে বেণুবাদনের ভঙ্গী করছেন, কখনো বা ময়ূরপুচ্ছ কুড়িয়ে নিয়ে মস্তকে গুঁজছেন। কখনো ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে বঙ্কিম নয়নে বঙ্কিম হাসি হাসছেন ইত্যাদি সব করছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীপাদের 'শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গমন করলেন, তখন প্রবাসজাত বিপ্রলম্ভ দশায় অর্থাৎ, নায়ক প্রবাসে গমন করলে তাঁর বিরহে নায়িকার মধ্যে যে অতি তীব্র অসহ্য, অশেষ বিরহ-বেদনার আলোড়ন দেখা যায়, তাঁর প্রভাবে শ্রীরাধার যে দশা হয়েছিল তা অবর্ণনীয়, অচিন্তনীয় ছিল। অগত্যা শ্রীললিতা সখী নিজের প্রাণপ্রিয়া সখীর সেই দশা দেখে আর স্থির থাকতে না পেরে পত্র লিখলেন মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের কাছে---

শ্রীমতী তোমার বিরহে দৈন্য সাগরে ডুবেছে। নিরাভরণা, মলিনবেশা, ভিখারিনীর ন্যায় দশা তার। মুখে কথা নেই। চিন্তাশক্তিও লুপ্ত হয়েছে। এমনকী উন্মাদ দশাটিরও প্রকাশ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। চোখের জলও শুকিয়ে গেছে। তাই, অশ্রু বিসর্জনও বন্ধ হয়ে গেছে। হে কংসারি, তোমার বিরহে সেই পদ্মের ন্যায় সুন্দরী শ্রীরাধার এখন একমাত্র সহচরী হয়েছে 'মূর্ছা'। (অর্থাৎ, তাঁকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। অনবরত সে মূর্ছা যাচ্ছে)

ললিতার পত্র পেয়ে শ্রীউদ্ধব মথুরা থেকে প্রত্যুত্তরে জানালেন

যে, শ্রীকৃষ্ণেরও একই দশা শ্রীরাধার বিরহে। রত্নখচিত ক্রীড়াগৃহে পালঙ্কে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় শয়ন করেও তিনি শান্তি পাচ্ছেন না। গিরিগুহার শিলাতটে শ্রীরাধার সঙ্গে তাঁর রতিবিলাসের কথা স্মরণে আসছে। আর তিনি কাতর হচ্ছেন মনঃকষ্টে। নিদ্রার মধ্যে তিনিও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ক্রন্দন করতে থাকেন, "রাধে, রাধে" বলে।

রসিকাকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীমদনমোহন এবং মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধিকার পারস্পরিক প্রেম যে এমনই প্রবল, প্রগাঢ় ! পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ থাকা অবস্থাতেও একে অপরের আনন তিলেক অদর্শনে বেদনাতুর হয়ে পড়েন। একে অপরের থেকে বিচ্ছেদ ভাবনায় ভীত হয়ে পড়েন। চিত্ত কেঁপে ওঠে উভয়েরই পরস্পরকে হারাবার ভয়ে, আশঙ্কায়। সেই তিলেক অদর্শনের বিরহ যদি ভবিতব্য হয়ে কোনোদিন নেমে আসে জীবনে এই দুর্ভাবনায় মুহূর্তেই দু'জনার বক্ষ যেন কম্পিত হয়। আরও অধিক নিবিড় আলিঙ্গনে তখন আবদ্ধ হন তাঁরা। পরস্পরের বাহুপাশে যেন আরও একটু গভীরাবদ্ধ হয়ে স্বস্তি, নিশ্চিন্ততার আশ্রয় তখন তাঁদের অন্বেষণ করা।

তাইতো, শ্রীচণ্ডীদাস লিখেছেন----

"দুহু কোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া।।"

কলিযুগে শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমহাপ্রভু তাঁর প্রদত্ত শিক্ষাষ্টমের সাত নং শ্লোক শিক্ষায় বললেন...

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রবৃষায়িতম্।
শূন্যাইয়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ।"

-অর্থাৎ, হে গোবিন্দ তোমার বিরহে এক নিমেষ কালকেও আমার এক যুগ মনে হচ্ছে। আমার দু'চক্ষু দিয়ে অনবরত অশ্রুবারির বর্ষণ হয়ে চলেছে। সমগ্র জগৎ আমার কাছে শূণ্য মনে হচ্ছে।

"রূপ-রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি,
কবে হাম বুঝবো সে যুগল পিরীতি ।।"

(শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনায়----)

হায় ! কবে এই অধমা রাধাবিনোদিনী দাসী সেই বিশুদ্ধ শ্রীযুগলপিরীতিকে অনুভব, অনুধাবন করে অন্তরের অন্তরতম অলিন্দে অনুরাগভরে আস্বাদন করতে পারবে তা ! কবে তা হৃদয়ে লালন করতে পারবে !

"রসিকাকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীমদনমোহন এবং মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধিকার পারস্পরিক প্রেম যে এমনই প্রবল, প্রগাঢ় ! পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ থাকা অবস্থাতেও একে অপরের আনন তিলেক অদর্শনে বেদনাতুর হয়ে পড়েন। একে অপরের থেকে বিচ্ছেদ ভাবনায় ভীত হয়ে পড়েন।"

সত্যকাম

পঞ্চমুখী

শুনো শুনো মহাজন শুনো সর্বজন
সত্যের কথাই শুনো সত্য সনাতন
ছান্দোগ্য উপনিষদ জানায় সম্মান
যেভাবে মানব হল দেব ব্রাহ্মণ।

বেদ শিখতে চায় ঋষিকুলে শিশু
অনুমতি চায় মায়ের সত্যের যীশু
গুরু কাছে যাবেই সে সত্য জিজ্ঞাসু
মাতৃ সম্মতিতে আনন্দিত বেদ পিপাসু।

গুরু গৌতম যিনি বসেছেন পাঠে
পাঠ শুনি বালকের মন ভরে ওঠে
বেদপাঠ শুনে শিশু আশ্রম মঠে
প্রণাম জানায় দেব-এ অঙ্গ আটে।

তুলি মুখ ঋষি কহে কী পরিচয়?
কেন এসেছ তুমি আশ্রম সীমায়?
পাঠ করিতে চাও শাস্ত্র বিষয়?
গভীর তত্ত্ব সব, জানো নিশ্চয়?

কী তব গোত্র বলো, পিতার নাম
শিশু বলে-- আমি সত্যকাম
গোত্র জানা নাই প্রভু---- প্রণাম
স্বপ্ন মোর তব শিষ্য হই-- এই মনস্কাম

ঋষি বলে, 'গোত্র দিয়ে বেদ পাঠ অধিকার
সবাই জানে যে গো শুনাই আবার
ঘরে যাও সত্যকাম এখন এই সার
ফিরে এলে হবে কথা যত কিছু আর।'

ঘরে ফিরি সত্যকাম মায়েরে জানায়
'বেদপাঠে গুরুগৃহে গোত্র জানা চায়
গোত্র জানালে মিটবে সকল অভিপ্রায়'।
মার কথা শুনে শুনে চিত্ত ভরে যায়---

'পিতৃগোত্রে হয় যবে শিশু পরিচিত
তোমার পরিচয় যে কিছু নয় সে মত
দেহ পসারিনি তাই; পুরুষ গর্বিত
তাতেই তব পুত্রজন্ম জেনো নিশ্চিত।

তোমার পরিচয় তুমি সর্বসার
তোমাতে আমাতে গোত্র একাকার
জবালা সত্যকাম নাম নিত্য যাহার
এই পরিচয় তুমি নাও বারংবার।।'

মহর্ষি গৌতম বসেছেন বেদপাঠে।
সত্যকাম আসিয়া প্রণমিল সমতটে।
মুনি বলে, 'দাও গোত্র পরিচয় এই মঠে'।
সত্যকাম নির্ভয়ে জানায় সব অকপটে।

হেসে ওঠে অন্য সকল বালক সমুদয়।
সত্যকাম এ হেন অবস্থায় স্থির রয়।
সকলি শুনিল মুনি— উচ্ছ্বসিত হৃদয়---
মন বুদ্ধির কত জোর দেখি এ সময়।

'সেই একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা লাভে ব্রতী
সত্য কথায় ধরো সত্য অভিরথী
সংগ্রহ করো কাঠ যজ্ঞ আরতি
উপনয়ন হবে, এটাই সম্মতি।।'

কাঠ আনি করে সত্য যজ্ঞ আয়োজন
ব্রাহ্মণ হল সে, হল আশ্রমের ধন।
মন বুদ্ধির জোর পরীক্ষা এখন
গৌতম মুনি তারে করে নিয়োজন।

শান্ত কণ্ঠে কহিল গৌতম মুনি--
'চারশো গাভী তোমা দিলেম এখনি
যত্ন করি তাদের পালন করো নবীনী।'
এই এক কাজে শুরু তার আত্মজীবনী

‘একহাজার গরু হলে ফিরে আসবে’।
গুরুবাক্য শিরে ধরে চলে মঙ্গল ভাবে
অন্তরেতে মহাসুখ মহতের স্বভাবে
চলে পরমধন রক্ষায় সত্য গরবে।

শীর্ণকায় গাভীদের খাদ্য খোঁজের তরে
ছুটে চলে এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তরে
রাতে তাদের একসঙ্গে রাখি ধ্যান করে
ফল মূল যা পায় তার তাতেই পেট ভরে।

এইভাবে দিন যায় মাস ও বৎসর
হৃষ্টপুষ্ট সব গাভী ভরে শিষ্যের অন্তর
একদিন এক ধ্বনি শুনিল গাভীর
‘দেখো চেয়ে সত্যকাম আমাদের ভিড়’

গুনে দেখে সত্যকাম হয়েছে হাজার
আশ্রমের পথ ধরে অন্তর যাহার
অন্তরেতে ভালোবাসা জাগে সবাকার
অহরহ কথা শুনি আত্মাতে আত্মার।

সন্ধ্যা নেমে আসে বৃক্ষতলে ঠাঁই
দেবাহুতির কারণে আগুন জ্বালায়
সচকিত যুবকের কানে প্রবেশায়
জ্ঞানের কথা বলে অগ্নিসূত্রায়

পরদিন দেখা মেলে এক হংসের
জ্ঞানের অধিকারী সেও বিশ্বের
সে পথ প্রদর্শক বেদজ্ঞানের
সাদার রঙে রাঙা আলো প্রভাতের

সেই আলোতে দেখা আরো এক পাখি
যার কাছে পেল সে যে সত্যে রাখি
আনন্দে বিহ্বল স্থির চিত্ত দেখি
গৌতম মুনি ধ্যানে দেখে তার আঁখি

আনন্দে বিহ্বল গুরু রয় প্রতীক্ষায়
শিষ্যের কঠিন ব্রত এসেছে সীমানায়
ফিরছে আশ্রমে এই তো আশ্রয়
ঋষিবর ক্ষণে ক্ষণে প্রহর গুনে যায়।

ফিরে সত্যের পথে সত্য সত্যকাম
আশ্রিত ঋষিরে করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম
রাখাল বালক আজ আসে নিজ ধাম
অন্তর জ্যোতির জালে উজ্জ্বল নাম

শিষ্যের কঠিন ব্রত হয়েছে সমাধান
শিষ্যরে বক্ষে ধরে আনন্দে আহ্বান
‘কীভাবে তোমার দেহে জ্যোতি আগমন
হৃষ্টপুষ্ট গাভীদের করেছ অতীব যতন।’

সত্যকাম করজোড়ে বলে যে সকলি
বায়ু অগ্নি প্রকৃতি পাখির কলকাকলি
গুরুরে জানায় শিষ্য একাত্ম বাখানি
‘আপনি প্রদান করো ব্রহ্মজ্ঞান খানি।’

এত শুনি ঋষি উক্তি, ‘আদর্শ ব্রাহ্মণ
তোমারে ওই জ্ঞান চলো করায় অধ্যয়ন
ব্রাহ্মণের পরিচয় ন’গুণ চয়ন
তুমিই তার অধিকারী সেই একজন ।’

‘ব্রাহ্মণের ন’গুণ নয়ের আধার
শম দম তপ শৌচ এই চার প্রকার
ক্ষান্তি সরলতা জ্ঞান বিজ্ঞান আর
আস্তিকম এই নয় গুণ এক পরিবার।’

ধন্য ধন্য সত্যকাম সত্যের রূপকার
জয় জয় জয় বলো জয়ের সম্ভার
গুরু শিষ্যের এই যুগল অভিসার
জাগ্রত হোক সব চিত্ত চমৎকার।।

ব্যক্তিত্ব—

প্রাণে খুশির তুফান উঠছে কই!

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

একসময় পরিচিত ছিলেন হাসির লেখক হিসাবে। এখন একেবারেই অন্য ঘরানার লেখক। তবে কি হাসি হারিয়ে গেল? নিজেই উত্তর দিলেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

একটা প্রশ্ন প্রায়ই শুনতে হয়। এখন আর হাসির লেখা লিখি না কেন? এখনকার লেখালেখিতে ধর্মীয় প্রসঙ্গ বেশি করে উঠে আসছে কেন? জীবন ও সাহিত্য থেকে কি তাহলে হাসি হারিয়ে গেল? নাকি আমি ধর্মে বেশি আসক্ত হয়ে পড়লাম? একটা কথা শুরুতে বলে নেওয়া যাক, অনেক হাসির লেখা লিখেছি। কিন্তু পরিণত বয়সে এসে জীবনের সারসত্যটা বুঝেছি। আমার কাছে সেরা রসিক মানুষ হলেন রামকৃষ্ণ। এই রসিক মানুষটাকে নিয়ে যখন লিখি, তাঁকে যখন বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করি, তখন সেখানে হাসি ব্যাপারটাকে চাইলেও দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। নিজের নিয়মেই হাসি চলে আসে। তবে মোড়ক আলাদা।

আমার লেখার কথা ভুলে যান। মানুষের দৈনন্দিন জীবনেই কি আর আগের মতো হাসি রয়েছে? মানুষ কি আগের মতো প্রাণ খুলে হাসতে পারে? সেটাই এখন সবথেকে বড়ো প্রশ্ন। চারদিকে প্রতিযোগিতা বাড়ছে। কোনো কিছুই আর সহজলভ্য নয়। ছোটো থেকেই ছুটতে হচ্ছে। ছেলে ছুটছে। ছেলের বা-মা ছুটছে। যে ছেলেটার খেলার কথা, দুষ্টুমি করার কথা, তাকে জোর করে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে কম্পিউটারের সামনে। বাবা-মায়ের ইচ্ছাপূরণ করতে হবে। পড়াশোনা শেষ হলেই কি রেহাই আছে? তখন ছুটতে হবে জীবিকার খোঁজে। সেখানেও তীব্র প্রতিযোগিতা। মাইনে যেমন, তেমনি থাকছে কাজের চাপ। কোম্পানি চাপিয়ে দিচ্ছে টার্গেট। ছোটো, আরো ছোটো। তোমার থামা নেই।

মানুষের জীবনে এখন সেই ফুরসত কই? আর্থিক সংকট, জীবিকার সংকট, ব্যক্তিগত জীবনের নানা টানাপোড়েনে আমরা সবাই কম বেশি ক্ষতবিক্ষত। হারিয়ে যাচ্ছে সেই সেন্স অফ হিউমার। মনে রসবোধ না থাকলে মুখে হাসি ফুটবে কী করে?

আমাদের যৌথ পরিবার ভেঙে গেছে। এখন হাম দো হামারা দো। দুই সন্তান কারো কারো কাছে বেশি মনে হচ্ছে। তাদের স্লোগান হাম দো হামারা এক। ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে নিউক্লিয়ার পরিবার। একটি সন্তান। মা-বাবার যাবতীয় প্রত্যাশার কেন্দ্র। কাকা, জ্যাঠা, দাদুর মতো সব চরিত্র কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছে। তাঁরাই তো ছিলেন রসের জোগানদার। সেইরকে বসে আড্ডা দেওয়ার দিন নেই।

প্রোমোটারির থাবায় পাড়ার সেই রকও নেই। রকের আড্ডা থেকেই কত হাসির গল্প জন্ম নিত।

এখন কি মানুষ একেবারে হাসে না? আসলে, চারপাশে সব কেমন যেন যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে। যেমন কর্পোরেট দুনিয়ার কথাই ধরা যাক। ঠোঁটের কোনে একটা মুচকি হাসির রেখা মাঝে মাঝে দেখা যায় ঠিকই, কিন্তু সে হাসির মধ্যে প্রাণ নেই। বসকে খুশি করার হাসি, কিছুটা তোষামোদের হাসি। ব্যস্ত মানুষের হাসি হল দেঁতো হাসি, ব্যঙ্গের হাসি কেজো হাসি। বোকারা নাকি হাসে আর চালাকরা মুখ বেজার করে থাকে। ভেতরে হাসি না থাকলে কাউকে জোর করে হাসানো যায় না। জীবনের নানা অসঙ্গতির মাঝেও অনেক হাসির উপাদান ছিল। জীবন যুদ্ধে লড়তে লড়তে এখন সেই ছোটোখাটো অসঙ্গতিগুলো চোখে পড়ে না।

বাংলা সাহিত্যে যার লেখনীতে হাসি প্রাণ পেয়েছিল, তিনি পরশুরাম। একদিকে তিনি ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মী। পারিবারিক কোনো দুঃশ্চিন্তা ছিল না। কলমে উঠে আসত হাসির ফল্গুধারা। আজকের সাহিত্যিকদের জীবিকার তাগিদে অন্য কাজ করতে হয়। মাথার তিন চতুর্থাংশ জুড়ে থাকে অন্য বোঝা। লেখার বিষয় বড়োই অল্প। মন ভারমুক্ত না থাকলে হাসির লেখা আসবে কোথা থেকে? একে তো বিষয় কমে গেছে, চারপাশে মজাদার লোকের সংখ্যা কমে গেছে। যদিও বা কিছু রয়েছে, আমরা হয়তো দেখতে ভুলে গেছি। কাউকে জোর করে হাসানো যায় না। তেমনি কাউকে হাসির লেখক তৈরি করা যায় না। হ্যাঁ, একসময় অনেক হাসির লেখা লিখেছি। লিখে আনন্দও পেয়েছি। এখন মজা করে বলি, আগে পচা মাছ বিক্রি করতাম, এখন ফুল বিক্রি করি।

লেখা আসে ভেতরের তাগিদে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে। প্রেমের গল্প, কবিতা যেমন আসে তেমনি হাসির লেখা আসে লেখকের কলমে। জীবনকে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। থাকতে হয় উচ্চ রসবোধ। তবে দুঃখ করে লাভ নেই। বিশ্বের সেরা হাসির লেখা যেখানে লেখা হত, সেই ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে হাসির লেখার খরা চলছে। পারিপার্শ্বিক চাপ, দুঃশ্চিন্তা ও সাংসারিক চাপে সাহিত্যে নির্মল হাসি থমকে গেছে। সময়ের নিয়মে আবার হাস্যরস আসবে। তার মাঝেই জীবনের ছোটো ছোটো মুহূর্তগুলো আরো জীবন্ত হয়ে উঠুক। শুধু ঠোঁটে নয়, মনেও হাসির চোরাস্রোত আসুক।

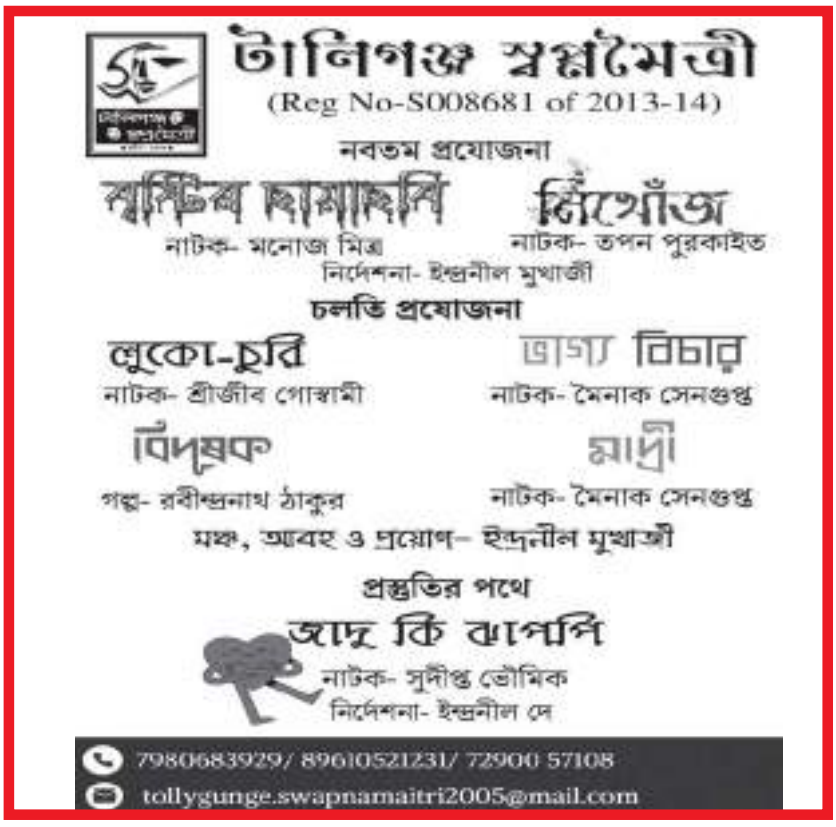

ব্যক্তিত্ব—

একটা সিগারেট খাওয়া নিয়ে রমাপদ চৌধুরী বউকে এত ভয় পাবেন, ভাবা যায়!

সিদ্ধার্থ সিংহ

আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় কতটা জনপ্রিয় সে কথা এখানে আলোচনার বিষয় নয়। তবে যাঁর হাত ধরে রবিবাসরীয় দিনের পর দিন পাঠকদের মনে জায়গা করে নিয়েছে, যাঁর সম্পাদনায় প্রতি রবিবার একটার পর একটা প্রাসঙ্গিক বিষয় সামনে এসেছে সেই রমাপদ চৌধুরীকে সামনে থেকে দেখেছেন তাঁর সহকারী সিদ্ধার্থ সিংহ। তাঁরই কলমে উঠে এসেছে রমাপদ চৌধুরীকে নিয়ে নানান কাহিনি ও স্মৃতি।

বহুদিন আগের কথা। রাধানাথ মণ্ডল তখন বেঁচে। সামনেই আমার ছেলের মুখেভাত। তাই ওর কাছে কিছু টাকা ধার চেয়েছিলাম। ও বলেছিল, দেব। ফলে মুখেভাতের সাত-আট দিন আগে থেকেই অফিসে ঢুকে আমার প্রথম কাজ ছিল রাধানাথদাকে জিজ্ঞেস করা, এনেছ?

আর প্রতিদিনই ও বলত, দেরি আছে তো। কাল নিয়ে আসব। মুখেভাতের আগের দিন যখন বললাম, এনেছ?

ও ব্যাগ-ট্যাগ হাতড়ে বলল, যাহ! টাকাটা খামে ভরেছিলাম। তার পর ব্যাগে ভরবো বলে বিছানার ওপরে রেখেছিলাম। মনে হয়, ভরতে ভুলে গেছি। বিছানার উপরেই পড়ে আছে। ঠিক আছে, কাল একবার কষ্ট করে এসে নিয়ে যেও। বলেই, বেরিয়ে পড়ল।

আমি মুখ ভার করে বসে আছি। কিচ্ছু ভাল লাগছে না। এই শেষ মুহূর্তে কার কাছে হাত পাততে যাব! এমন সময় ঘরে ট্রলি নিয়ে চা ঢুকেছে। রমাপদবাবু, নীরেনদাকে চা দিয়েছেন। আমার কাছে চা নিয়ে আসতেই ইশারায় বললাম, লাগবে না। আমার কথা শুনে ঘরের কোনের দিকে চেয়ারে পা গুটিয়ে 'দ' হয়ে বসে থাকা রমাপদবাবু বলে উঠলেন, খান খান, চা

খান।

উনি গরমকালেও ওভাবে বসতেন। চটি পরলেও মোজা পড়তেন। গায়ে শাল জড়াতেন। কারণ, উনি একদম ঠান্ডা সহ্য করতে পারতেন না। অথচ আমাদের পুরো অফিসটাই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

উনি সবাইকেই 'আপনি' করে বলতেন। আর আমি সবাইকে দাদা সম্বোধন করলেও, রমাপদবাবুর সব চেয়ে কাছের যে বন্ধু, যাঁদেরকে বলা হত হরিহর আত্মা, একসঙ্গে সিগারেট খেতে নামতেন, টয়লেটে গেলেও একসঙ্গেই যেতেন, রমাপদবাবুর থেকে যিনি মাত্র এক বছর দশ মাসের ছোটো, সেই নীরেনদা, মানে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকেও আমি নীরেনদা বলেই ডাকতাম। অথচ কেন জানি না, সেই প্রথম থেকে একমাত্র রমাপদ চৌধুরীকেই আমি 'রমাপদবাবু' বলতাম। একইসঙ্গে ভীষণভাবে সম্মান করতাম। ফলে উনি কোনও কিছু বললে আমার পক্ষে 'না' বলাটা ছিল একেবারে অসাধ্য। তাই উনি বলতেই কোনওরকমে চা খেয়ে রমাপদবাবুর কাছে গিয়ে বললাম, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। আমি বাড়ি যাচ্ছি। বলেই, ঘর থেকে যখন বেরিয়ে আসছি, রমাপদবাবু বললেন, এখনই যাচ্ছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

উনি বললেন, শুনুন।

কাছে যেতেই ড্রয়ার খুলে একটা খাম বের করে আমাকে দিয়ে বললেন, এখানে খুলবেন না। বাড়ি গিয়ে দেখবেন।

কিন্তু আমার তর সইছিল না। সোজা টয়লেটে ঢুকে ছিটকিনি তুলে খামটা খুলতেই আমি হতবাক। যে টাকাটা রাধানাথদার কাছে ধার চেয়েছিলাম, উনি তার দশগুণ টাকা খামে ভরে আমাকে দিয়েছেন।

এই হচ্ছেন রমাপদ চৌধুরী।

রমাপদবাবুর এটিএম কার্ড আমার কাছেই থাকত। যখন যা লাগত, আমাকে বললেই আমি সেই টাকা তুলে ওঁর কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতাম।

একদিন সকালে একটা অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন করে বললেন, শুনুন, আমার দুটো ফোনই খারাপ হয়ে গেছে। আমি কাজের মাসির মোবাইল থেকে আপনাকে ফোন করছি। যত তাড়াতাড়ি পারেন টাকা তুলে একটা মোবাইল কিনে নিয়ে আসুন তো।

দুটো ফোনের মধ্যে একটার বিল উনি দেন। অন্যটা আনন্দবাজার থেকে সেই কোন যুগে দিয়েছে। পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে যতক্ষণ খুশি কথা বলা যায়। বিল দিয়ে দেয় আনন্দবাজার সংস্থা।

দুটো ফোনই যখন খারাপ হয়ে গেছে কমপ্লেন করলেও ঠিক হতে হতে অন্তত দু'-চার দিন তো লাগবেই। তাই বললাম, ঠিক আছে আমি মোবাইল কিনে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কত টাকার মধ্যে কিনব?

উনি বললেন, কিনুন না, একটা ভালো দেখে কিনুন।

আমি বললাম, তাও কী রকম বাজেটের মধ্যে?

উনি বললেন, টাকার জন্য একদম চিন্তা করবেন না। যত টাকা লাগে লাগুক। আপনি আমার জন্য একটা ভালো ফোন নিয়ে আসুন।

তাও ইতস্তত করছি দেখে উনি বললেন, বললাম তো, দামের জন্য ভাববেন না। যত টাকা লাগে লাগুক। লাগুক না, হাজার টাকা লাগুক।

সেদিন সব চেয়ে কম দামের, মানে ১২০০ টাকার একটা পাতি মোবাইল কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। ফোনটা হাতে নিয়ে উনি অবাক হয়ে বলেছিলেন, একটা ফোনের দাম বারোশো টাকা! তা হলে আপনার মোবাইলটার দাম কত?

আমি বলেছিলাম, ষোলো হাজার।

দাম শুনে উনি মূর্ছা যান আর কী!

এই হচ্ছেন রমাপদ চৌধুরী।

তখন অফিস থেকে বেরোতাম রাত সওয়া একটায়। বাড়ি

ফিরতে ফিরতে পৌনে দুটো। উঠতাম বেলা করে। একদিন সক্কালবেলায় ফোন। তুলতেই ও প্রান্তে রমাপদবাবুর গলা, উঠেছেন?

ঘুম-জড়ানো গলায় বললাম, হ্যাঁ, এই উঠছি।

উনি বললেন, এখন উঠছেন? ঠিক আছে, তা হলে তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। আপনি ধীরে সুস্থে আধ ঘণ্টা পরে আসুন। তখন যে অবস্থায় ছিলাম, ঠিক সেই অবস্থাতেই যদি আমি তক্ষুনি গাড়ি নিয়ে বেরোই, আধ ঘণ্টা কেন, এক ঘণ্টাতেও পৌঁছতে পারব কিনা সন্দেহ।

তবে অত সকালে যখন ফোন করেছেন, নিশ্চয়ই কোনও জরুরি দরকার। তাই তড়িঘড়ি বেরিয়ে ওঁর বাড়ি গিয়ে দেখি, ওঁর কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। খোশমেজাজে চুপচাপ সোফায় বসে আছেন। আমাকে দেখে স্ত্রীকে বললেন, সিদ্ধার্থ এসেছে, চা করো।

স্ত্রী যেই চা করতে গেলেন উনি আমাকে চুপিচুপি বললেন, একটু বেরোব।

ওঁর বেরোব মানে কী, আমি জানি। বেরিয়েই ট্যাক্সি নিয়ে সোজা সিগারেটের দোকানে। ট্যাক্সিটা একটু এগিয়ে দাঁড় করাতে হয়। কারণ, ওই দোকানদার নাকি তাঁকে চেনে। সে যদি তাঁকে দেখতে পেয়ে যায় এবং তাঁর জন্য সিগারেট কেনা হয়েছে, এটা টের পায় তাহলে তাঁর স্ত্রীকে সে-কথা বলে দিলেই কেলেঙ্কারি কাণ্ড।

তো, সিগারেটের দোকান থেকে একটা ক্লাসিক, আসলে উনি ক্লাসিক সিগারেট ছাড়া অন্য কিছু খেতেন না। সেই ক্লাসিক আর একটা দেশলাই বাক্স, সঙ্গে একটা লজেন্স নিয়ে আমি ফের গাড়িতে উঠি। উঠেই, সিগারেট ধরানোর জন্য দেশলাইটা জ্বালাতে যাব, প্রতিবারের মতো অমনি উনি বলে উঠলেন, সাবধান। আগুনের ফুলকি যেন আমার ধুতিতে না পড়ে।

না, ফুলকি পড়লে ধুতিটা পুড়ে ফুটো হয়ে যাবে বলে নয়, ফুলকি পড়লে ওঁর স্ত্রী টের পেয়ে যাবেন, উনি সিগারেট খেয়েছেন। তাই এই সাবধানবাণী। ছিয়ানব্বই-ঊর্ধ্ব অত্যন্ত সফল একজন মানুষ যে সামান্য একটা সিগারেট খাওয়া নিয়ে বউকে এত ভয় পাবেন, ভাবা যায়!

এই হচ্ছেন রমাপদ চৌধুরী।

আর একটা জিনিসকে উনি খুব ভয় পেতেন, সেটা হল--- ইনকাম ট্যাক্স। উনি যখন 'বনপলাশীর পদাবলী', যে উপন্যাসটা নিয়ে উত্তমকুমার সিনেমা করার পর হইহই পড়ে গিয়েছিল, সেটার জন্য এক কোটি টাকা পুরস্কার পেলেন, তখন উনি প্রথমেই ঠিক করে ফেলেছিলেন, ওই টাকায় হাত দেওয়ার আগেই ট্যাক্সটা মিটিয়ে দেবেন।

আমি বলেছিলাম, ট্যাক্স জমা দেওয়ার তো এখনও প্রচুর সময় আছে। পরে দেবেন। অত দিন এই টাকাটা ব্যাঙ্কে থাকলে কত টাকা সুদ পাবেন, জানেন?

উনি বলেছিলেন, আমি যদি কালই মরে যাই, ইনকাম ট্যাক্সের লোকেরা আমার বউকে এসে ধরবে। আমি সেটা চাই না। কারণ, ও ওগুলোর কিচ্ছুই বোঝে না।

না, উনি আর দেরি করেননি। পুরস্কারের চেকটা ক্যাশ হওয়ামাত্রই স্টেট ব্যাঙ্কে গিয়ে আগাম ৩৩ লক্ষ টাকা ট্যাক্স মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

এই হচ্ছেন রমাপদ চৌধুরী।

উনি বছরে একটাই উপন্যাস লিখতেন। উল্টোরথের দিন লেখা শুরু করতেন। একটা কলম দিয়ে একটাই উপন্যাস লিখতেন। তার পর আর ওই কলম ব্যবহার করতেন না। তবে সব কলম নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।

আমার ছেলে শুভঙ্কর সিংহ লেখালিখি করছে শুনে, যে পার্কার পেন দিয়ে উনি 'বনপলাশীর পদাবলী' লিখেছিলেন, যে কলম দিয়ে 'লালবাঈ' লিখেছিলেন এবং যে কলমে 'খারিজ' লিখেছিলেন, সেই তিনটি কলম আমার ছেলেকে দিয়ে বলেছিলেন, এগুলো দিয়ে লিখো।

প্রমাণ হিসেবে প্যাডের পাতায় লিখেও দিয়েছিলেন, আমার ছেলের হাতে তাঁর কলম তুলে দেওয়ার কথা।

ওই কলম দিয়েই আমার ছেলে লিখেছিল তার প্রথম বেস্টসেলার বই--- 'গড : এনসিয়েন এলিয়েন্ট অর আ মিথ?' এই হচ্ছেন রমাপদ চৌধুরী।

একবার আমি ঠিক করেছিলাম একটা প্রকাশনা করব। শুরু করব রমাপদবাবুর বই দিয়ে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত টুকরোটাকরা লেখা দিয়ে নয়, এমন পাণ্ডুলিপি চাই, যেটা শুধু আমার প্রকাশনীর কথা ভেবেই উনি লিখবেন। সেটা অন্য কোথাও নয়, সরাসরি বই আকারে বের করব। রমাপদবাবুকে বলতেই উনি বললেন, আপনি পাবলিকেশন করবেন? ঠিক আছে, দেব।

সেই কথা মতো উনি মাঝে মাঝেই আমাকে কিছু কিছু করে পাতা লিখে দিতেন। আমি সেটা কম্পোজ করিয়ে প্রথম প্রুফটা দেখে রাখতাম। দেখতে দেখতে পুরো উপন্যাসটা ছাপা হয়ে গেল। প্রথম মুদ্রণ পাঁচশো কপি। কিন্তু যাঁকে প্রচ্ছদ আঁকতে দিয়েছিলাম, আজ দিচ্ছি, কাল দিচ্ছি করে সে এত দেরি করিয়ে দিল যে, যখন প্রচ্ছদ হাতে পেলাম, ততদিনে বাঁধাইখানার মালিক গোডাউন খালি করার জন্য বহু দিন ধরে স্তূপাকৃত হয়ে পড়ে থাকা ফর্মাগুলোর সঙ্গে রমাপদবাবুর উপন্যাসের শেষ ফর্মাটাও ভুল করে কিলো দরে বেচে দিয়েছেন।

উনি মাঝে মাঝেই আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, আপনার পাবলিকেশনের কী হল?

আমি বুঝতে পারতাম, আসলে উনি জানতে চাইছেন, ওঁর বইটার কত দূর কী হল? কবে বেরোবে?

একদিন বুক ঠুকে বলেই ফেললাম নির্মম সত্যিটা। উনি বললেন, কপি নেই? কিংবা কাটা প্রুফ?

আমি বললাম, না। থাকলে তো ওটা থেকেই ফের কম্পোজ করিয়ে নিতে পারতাম।

উনি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, লাস্ট ফর্মাটা তো? ঠিক আছে, চিন্তা করবেন না। আমি আবার লিখে দেব। শুধু যে তিনটে ফর্মা পাওয়া গেছে, তার একটা করে সিট আমাকে দিয়ে যাবেন। কী লিখেছিলাম মনে নেই তো! একবার দেখে নিতে হবে।

কিন্তু না, উনি আর শেষ ফর্মাটা লিখে দিয়ে যেতে পারেননি। তাই 'মঞ্জুধারা' শুধু অপ্রকাশিত উপন্যাস হয়েই নয়, অসমাপ্ত উপন্যাস হিসেবেই রয়ে গেছে আমার কাছে। এ জন্য খারাপ কথা বলা দূর অস্ত, পাছে আমি দুঃখ পাই, আমার মন খারাপ হয়ে যায়, তাই ওই 'মঞ্জুধারা' নিয়ে উনি আমার সামনে কখনও কোনও আফসোসও করেননি।

এই হচ্ছেন রমাপদ চৌধুরী।

সরস্বতী পুজোর দিন হঠাৎ ফোন, এক্ষুনি আসুন।

আমি তড়িঘড়ি গেলাম। দরজা খুলেই উনি বললেন, আজকের দিনে মাংস খান তো?

আমি যে মাংস খেতে ভালোবাসি, আমার কাছের লোকজনরা প্রায় সকলেই তা জানেন। তাই সুচিত্রাদি, মানে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের বাড়িতে মাংস হলেই, তিনি আমাকে দুপুরের আগেই ফোন করতেন। বলতেন, চলে আয়। আজ দারুণ মাংস হয়েছে।

আমি শুধু দুপুরেই খেতাম না। খাওয়াদাওয়া করে দুপুরে ওখানে

ঘুমিয়ে অফিস যাওয়ার আগে আর এক প্রস্ত মাংস-রুটি খেয়ে তার পর অফিসের দিকে রওনা হতাম।

আমার মাংস-প্রীতির কথা রমাপদবাবুও জানতেন। কিন্তু আজ তো সরস্বতী পুজো, সবাই এ দিন আমিষ খায় না, তাই বুঝি উনি এটা জিজ্ঞেস করছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, খাই।

উনি বললেন, বাঃ! খুব ভালো কথা। আসুন আসুন। আজ আমাদের বাড়িতে মাংস হয়েছে।

আমি তো দারুণ খুশি। চা এল। ঘুগনি এল। সোনপাপড়ি এল। আইসক্রিম এল। আমি আইসক্রিম ভালোবাসি বলে উনি আমার জন্য দু-তিন রকমের আইসক্রিম বার কিনে ফ্রিজে মজুত করে রাখেন। একের পর এক খাচ্ছি। আবার চা এল। এদিকে আমার তাড়া আছে। সবই খাচ্ছি। কিন্তু মাংস কোথায়! সরাসরি কিছু বলতেও পারছি না। মাংসের কথা বললে আমাকে হ্যাংলা ভাবতে পারেন, তাই মাংসের কথা মনে করানোর জন্য আমি একটু ঘুরিয়ে বললাম, এবার তা হলে উঠি?

রমাপদবাবু বললেন, ঠিক আছে, আসুন তা হলে...

বুঝতে পারলাম, উনি কী জন্য আমাকে ডেকেছেন সেটা একদম ভুলে গেছেন। তাই বউদিকে বললাম, আসি তা হলে?

উনিও বললেন, হ্যাঁ আসুন। সাবধানে যাবেন।

তখন বাধ্য হয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে বললাম, না, রমাপদবাবু বলছিলেন আজ নাকি কী সব মাংস-টাংস হয়েছে...

সঙ্গে সঙ্গে রমাপদবাবু বললেন, হ্যাঁ, হয়েছে তো। এই তো খেলেন।

আমি তো অবাক, আমি মাংস খেয়েছি! নিশ্চয়ই ওঁরা কোথাও একটা ভুল করছেন। তাই বিড়বিড় করে বললাম, কখন?

উনি বললেন, কেন? ঘুগনি খাননি? ঘুগনির মধ্যেই তো মাংসের কিমা ছিল।

এর পর আর কিছু বলার থাকে না। সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে আমি নীচে নেমে এসেছিলাম।

পরদিন সক্কালবেলায় রমাপদবাবুর ফোন, একটু দরকার আছে, আসুন তো।

গিয়ে বসতে না বসতেই দেখি, আমার সামনের টেবিলে এক বাটি মাংস। বউদি বললেন, আপনার রমাপদবাবু বললেন, আজকে মাংস করতে। বললেন, একটু বেশি করে কোরো। সিদ্ধার্থ খাবে। বউদির কথা শুনে আমি একেবারে হতবাক।

এই হচ্ছেন রমাপদ চৌধুরী।

বহু বছর পরিষ্কার করা হয় না। হলেও কোনওরকমে দেখে বোঁচকা-টোঁচকা বেঁধে আবার ওপরে তুলে রাখা হয়। একবার সিলিঙের ওপরে কী আছে দেখার জন্য ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমি হঠাৎ একটা পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাই। কয়েক পাতা পড়ার পরেই বুঝতে পারি, এই লেখাটা রমাপদবাবু ছাড়া আর কারও নয়। কিন্তু হাতের লেখাটা যেন একটু কেমন কেমন এবং পাণ্ডুলিপির চেহারাটা দেখে আমার মনে হয়, এটা অপ্রকাশিত। কিন্তু কথা হচ্ছে, যে লোকটাকে বারবার তাগাদা দিয়েও লেখানো যায় না, লেখা শুরুর আগেই 'বুক' হয়ে যায় কোন পত্রিকায় বেরোবে, তাঁর লেখা কি কখনও এভাবে পড়ে থাকতে পারে!

সঙ্গে সঙ্গে রমাপদবাবুর কাছে ছুটে গেলাম। পাণ্ডুলিপিটা তাঁকে দেখালাম। উনি হাতে নিয়ে একটু উল্টেপাল্টে দেখে বললেন, এটা কোথায় পেলেন?

তার পর তিনি যা বললেন, সেটা আরও চমকপ্রদ। বললেন, এটা প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে লেখা আমার আত্মজীবনীমূলক একটা গদ্য।

কিন্তু কী লিখেছেন, তা নাকি তাঁর নিজেরই মনে নেই। আমি যদি পাণ্ডুলিপিটা তাঁর কাছে দিয়েও আসি, উনি পড়বেন কী করে! আঁতসকাচ দিয়েও কি পড়তে পারবেন!

তাই ঠিক করলাম, আমার অফিস যেহেতু সন্ধ্যাবেলায়, অফিস যাওয়ার আগে প্রতিদিন দুপুরে ওঁর বাড়ি গিয়ে যে-দিন যতটা পারব, ওঁকে পড়ে শোনাব। আমি শোনাতাম।

একদিন উনি বললেন, এটা যখন লিখেছিলাম, তখন তো বয়স অল্প ছিল। সব কথা অকপটে লিখেছিলাম। কিন্তু এটা যদি এখন ছাপা হয়, আমার নাতনিরা তো বড়ো হয়েছে, ওরা কী ভাববে!

ফলে আপত্তিকর অংশগুলো নির্মমভাবে কেটে কেটে বাদ দিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের জন্য দিয়ে দেওয়া হল দেশ পত্রিকায়। যেহেতু ওটা হারিয়ে গিয়েছিল, তাই সেই স্মৃতি ধরে রাখার জন্য উনি ওটার নাম দিলেন--- হারানো খাতা।

পরে দু'মলাটে বন্দি হয়ে যখন আনন্দ পাবলিশার্স থেকে বই আকারে বেরোল, তখন দেখলাম, দীর্ঘ ছ'পাতার ভূমিকার ছত্রে ছত্রে তিনি শুধু আমার কথাই লিখেছেন।

এই হচ্ছেন রমাপদ চৌধুরী।

তখন উনি গলফগ্রিনের বাড়িতে। ডেস্কটপ চালু হলেও ল্যাপটপ এসেছে কি আসেনি। অনেকেই টাইপ রাইটার ব্যবহার করতেন। রমাপদবাবুও করতেন। আমার ছেলে তখন খুব ছোটো। স্কুল ছুটির পরে ওকে কোনও দিন নিয়ে যেতাম পরিতোষ সেনের বাড়িতে। কোনও দিন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। আবার কোনও দিন সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে। সে দিন গিয়েছিলাম রমাপদবাবুর বাড়ি।

ও দূর থেকেই টাইপ রাইটার দেখে এক ছুটে সেখানে গিয়ে ঠকাস ঠকাস করে বোতামগুলোয় মারতে শুরু করেছিল। আমি খেয়াল করিনি। খবরের কাগজ উল্টাচ্ছিলাম। রমাপদবাবু হঠাৎ ঘরে ঢুকে ওটা দেখামাত্রই এমন চিৎকার করে উঠেছিলেন যে, আমার ছেলে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে থতমত খেয়ে রমাপদবাবুর দিকে তাকাতে তাকাতে গুটিগুটি পায়ে আমার পাশে এসে চুপটি করে বসে পড়েছিল।

রমাপদবাবুর ব্যবহারে আমি বেশ মর্মাহতই হয়েছিলাম। ওঁর স্ত্রী দারুণ পুডিং বানাতেন। আমার খুব প্রিয় ছিল তাঁর হাতের পুডিং। এমন চেটেপুটে খেতাম যে, ফের অন্তত একবার, কোনও কোনও দিন দু'বার পুডিং দিতে হত। তবু সেদিন পুডিং না খেয়েই ছেলেকে নিয়ে আমি চলে এসেছিলাম।

পরদিন সকালে শুধু টাইপ টাইটারই নয়, সুদৃশ্য বড়ো একটা এল নকশার টেবিল আর রিভলভিং চেয়ার আমার ছেলের জন্য কিনে উনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এই হচ্ছেন রমাপদ চৌধুরী।

তখনও পরিবার বা নিকট কয়েকজন আত্মীয় ছাড়া কেউই জানেন না, রমাপদবাবু বেলভিউ ক্লিনিকে ভর্তি। আমার কাছে খবর পেয়ে রমাপদবাবুর অত্যন্ত প্রিয় পাত্রী, যিনি রমাপদবাবুর শেষ সাক্ষাৎকারটা নিয়েছিলেন, বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী, টিভি প্রেজেন্টার, গল্পকার, গায়িকা এবং কবি মধুবন চক্রবর্তী ওই নার্সিংহোমে তাঁকে দেখতে এলেন। রমাপদবাবু ওঁকে তাঁর বড়ো মেয়ে মহুয়ার মেয়ে, মানে বড়ো নাতনি ভেবে বারবার ভুল করছিলেন।

উনি কিছুতেই এক ভাবে শুতে পারছিলেন না। এপাশ ওপাশ করছিলেন। না, ছিয়ানব্বই বছর বয়সের জন্য না। শরীরটায় কোনও মাংস না থাকায় বোধহয় যে দিকেই পাশ ফিরছিলেন হাড়ে লাগছিল। তবু তাঁকে একটু রিলিফ দেওয়ার জন্য নার্সরা নানান হাতল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খাটের মাথার দিকটা খানিক পরে পরেই উপর-নীচ করছিলেন।

বউ-মেয়ে বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে? উনি ততবারই বোঝাতে চাইছিলেন, পিঠে ব্যথা হচ্ছে। হাতে ব্যথা হচ্ছে। নাকে গোঁজা নলটার জন্য অস্বস্তি হচ্ছে। আর মধুবনের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকেই একটা কথা বলছিলেন, আমার খুব খিদে পেয়েছে। আমি দুধ-ভাত খাব।

তখন সবে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে। দুধ-ভাত কোথায় পাব? না, তাঁকে আর দুধ-ভাত দেওয়া যায়নি। কোনও দিন দিতেও পারব না। তবু এখনও যেন কানে বাজছে রমাপদবাবুর সেই করুণ আর্তি--- আমি দুধ-ভাত খাব। আমি দুধ-ভাত খাব।

আমি যখন রমাপদবাবুর সহকারী হিসেবে আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়তে কাজ করতে যাই, প্রথমদিনই উনি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আপনি যখন এই অফিসে ঢুকবেন, আপনার যত রাগ, ক্ষোভ, দুঃক্ষ, হা-হুতাশ আছে, সব গেটের বাইরে রেখে ঢুকবেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখবেন, আপনার শত্রুও যদি ভালো লেখে, তার বাড়ি বয়ে গিয়ে লেখা নিয়ে আসবেন। আর আপনার বন্ধুর লেখা যদি নট আপ টু দ্য মার্ক হয়, তা হলে জোড়হাত করে তাঁকে বিদায় করবেন। মনে থাকবে?

তাঁর কাছে আমি যতদিন কাজ করেছি এবং পরবর্তী কালে শুধু তাঁর সঙ্গে যৌথভাবেই নয়, অন্য কারও সঙ্গে কিংবা এককভাবেও যখন কোনও সংকলন সম্পাদনা করেছি, তাঁর এই উপদেশটা আমি সব সময় মনে রেখেছি। তাই আমার বারবার মনে হয়, রমাপদবাবুর এই চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে বাংলা সাহিত্যের একটা অপূরণীয় ক্ষতি হল, তাই-ই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল সম্পাদনার স্বর্ণযুগ।

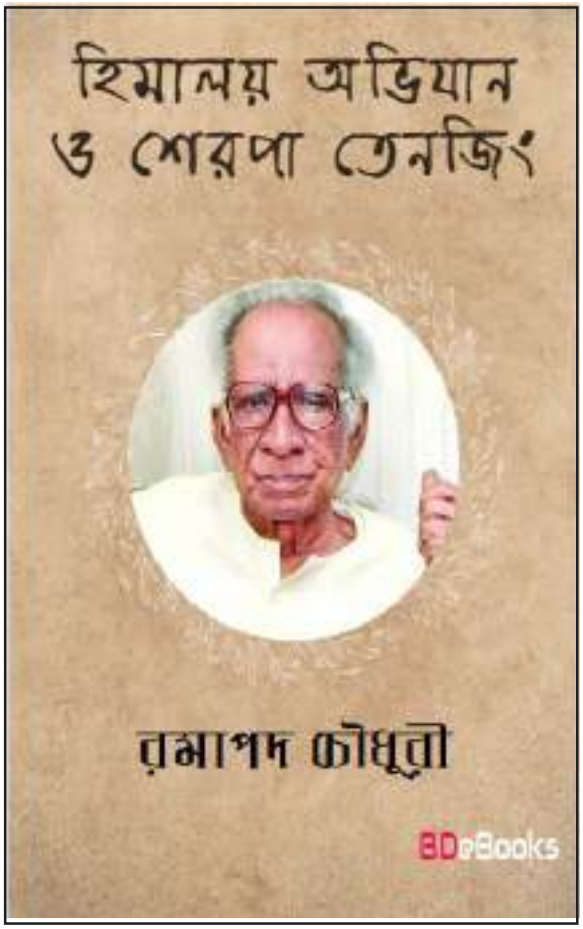

ব্যক্তিত্ব—

অন্যের বউ ভাগিয়ে নিয়ে আসছ না তো?

রমাপদ পাহাড়ি

'সমরেশ, কলমে ৫০ জীবনে ৭৫'। এই শিরোনামে প্রকাশ পাবে মাসিক পত্রিকার প্রচ্ছদ কথা। ২০১৭ সালের মার্চ সংখ্যা। তার আগে ফেব্রুয়ারিতে হইহই করে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে সমরেশ মজুমদারকে নিয়ে সংখ্যা প্রকাশের। সম্ভাব্য কী কী থাকবে, তারও হদিশ দেওয়া হয়েছে। সমরেশ মজুমদার নতুন করে তাঁর 'ঘরে ফেরা'র কথা শুরু করবেন। বিমল কর-এর লেখার পুনর্মুদ্রণ হবে। সমরেশের সঙ্গে জুড়ে থাকা, জড়িয়ে থাকা সবিতেন্দ্রনাথ রায় ওরফে ভানুবাবু থেকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার বসুর স্মৃতি-সংলাপে ভরে উঠবে পত্রিকার পাতা। সঙ্গে এক্সক্লুসিভ, সমরেশ-জায়া ধীরা মজুমদার ও কনিষ্ঠ কন্যা পরমা-র চোখে লেখক। বেশ কিছু অদেখা ছবিও জ্বলজ্বল করবে পত্রিকার পাতায়।

সমরেশ নিজেও খোঁজ নিয়েছেন, এই বিশেষ সংখ্যায় কারা লিখছেন বা বলছেন সে বিষয়ে। নিজেই বলেছেন, আর কারও লেখা থাকুক চাই না থাকুক, ভানুবাবুর লেখা কিন্তু রেখো। দুই কন্যা দোয়েল-পরমাকে লেখার অনুরোধের কথাও জানেন। শুধু আড়াল ছিল ধীরা বউদির প্রসঙ্গ। পত্রিকার পাতায় বিজ্ঞপ্তি দেখে, হাঁ মুখ করে শুধু জিজ্ঞাসা ছুড়েছেন, 'ধীরা লিখবে বলেছে'?

---না। লেখার বিষয়ে অনুরোধ করায় বলেছেন, উনি নাকি লিখতে পারেন না! খুবই শুষ্কং কাষ্ঠং এক মানুষ।

পারে পারে, লেখার হাত আছে। খুবই রসিক। কিন্তু কোথাও কিছু লেখে না। আমি নিশ্চিত, ওকে দিয়ে লেখাতে পারবে না।

না লিখলে, ইন্টারভিউ নেব।

ওমা, সে কি! সে তো আরও সাংঘাতিক। দ্যাখো চেষ্টা করে! ধীরা কিছু লিখবে না, বলবেও না। এ আমি নিশ্চিত।

সমরেশদার এই 'কনফিডেন্স'টাই জেদ বাড়িয়ে তুলেছিল। ধীরা বউদির লেখা না পাই, অন্তত ইন্টারভিউ ছাপতেই হবে। এবং তা নিয়ে সমরেশদার অলক্ষ্যে বারকয়েক বউদির সঙ্গে ফোনাফুনি হয়েছে। দোয়েল-পরমার সঙ্গেও। লেখার জন্য, এক্সক্লুসিভ ছবির জন্য।

'সমরেশ মজুমদার বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশের দিনক্ষণ ততদিনে হামাগুড়ি নয় দৌড় দিতে শুরু করেছে। ওদিকে তখনও সমরেশ-জায়ার সাক্ষাৎকার নেওয়া বাকি।

প্রতিবেদনের শুরুর কথাগুলি এমন ক্রান্তিকালে লেখক-প্রতিবেদকের।

(২)

---প্লিজ, ছেড়ে দাও।

---আপনি বুঝতে পারছেন না দাদা!

সমরেশ মজুমদার এবং এই প্রতিবেদকের বাক্যালাপ। শ্যামপুকুর স্ট্রিটের বাড়ির গ্রাউন্ড ফ্লোরে।

---কি আর বুঝব! এটা কি না করলেই নয়!

বিজ্ঞাপনে নাম দিয়ে দিয়েছি। এখন কোনওভাবেই ইন্টারভিউ না নিলে নয় সমরেশদা!

ও তো কত বিজ্ঞাপনে কতজন কত কথা বলে! সব কি আর! প্লিজ, ছেড়ে দাও!

দাদা, এটা এক্সক্লুসিভ। আপনাকে নিয়ে সংখ্যা বেরোবে আর সেখানে বউদির কথা থাকবে না? এটা অসম্ভব!

আরে, লিখে দাও না, সমরেশ-জায়া অসুস্থ। তাই তাঁর সাক্ষাৎকার প্রকাশে আমরা অপারগ।

বউদির সঙ্গে আমার কথা হয়ে গিয়েছে। উনি বলেছেন, ইন্টারভিউ দেবেন।

ওমা, সে কি! কথাও বলে ফেলেছ?

সে তো প্রায় মাসদুয়েক আগে। হপ্তাখানেকের মধ্যেও কথা হয়েছে বউদির সঙ্গে।

দীর্ঘদেহী, দাপুটে সমরেশ। ধমকাই-চমকাইতে এই প্রতিবেদকের সাক্ষাৎ যম। 'উত্তরাধিকার', 'কালবেলা', 'কালপুরুষ'-এর সেই

লেখক কিনা শুঁয়োপোকাসুলভ পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির সামনে এতটাই আনত? এতটাই অনুরোধে কাতর? এতটাই বিনয়ী? দুষ্টু বুদ্ধিটা চিড়িক করে উঠল। বললাম, তাহলে কাল আসি দাদা! বউদির ইন্টারভিউয়ের জন্য?

টেবিলের উল্টোদিকে তখন আনমনা সমরেশ। জানলার ফাঁকফোকরে আটকে থাকা চোখ। নিতান্ত অসহায়। ভেতরে ভেতরে বোধ করি নুয়ে পড়া এক মানুষ।

চুপ থাকলেন কিছুক্ষণ। ফের ঠোঁট-শুকনো জিজ্ঞাসা।

বউদির সাক্ষাৎকার না নিলে কী হবে? তোমাদের পত্রিকার সার্কুলেশন কমে যাবে? ঠিক আছে, আমি না হয় এই সংখ্যায় লেখার টাকাটা নেব না! প্লিজ, একটুখানি বোঝার চেষ্টা করো! একজন লেখককে নিয়ে সংখ্যা করছ, তার বউয়ের কী দরকার! আমি ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারছি না! প্লিজ, ছেড়ে দাও!

বলেই চলেছেন সমরেশ। ঝরে পড়ছে উপরোধ-অনুরোধের সহস্রধারা। মনে পড়ে যায়, হাতি-চামচিকির প্রবচনটা। কৌতূহল গভীর থেকে গভীরতম হয়। জেদ বাড়ে। পত্রিকায় বেরোনো বিজ্ঞপ্তির যথার্থতা বজায় রাখার দায়িত্ব বাড়ে। সাংবাদিকসুলভ 'এক্সক্লুসিভ' প্রতিবেদনের প্রতি ঝোঁক বাড়ে। তাই সেদিন সমরেশ মজুমদার নামক সাহিত্য মহারথীর (হিন্দিসুলভ হস্তি) বেয়াড়া অনুরোধ উপেক্ষা করে নিজ দায়িত্বে, আপন সিদ্ধান্তে অটল থাকি।

মনের ভিতরঘরে অগাধ জিজ্ঞাসা, বউদির সাক্ষাৎকার নেওয়ার ক্ষেত্রে এত আপত্তি কেন সমরেশদার?

(৩)

২০০২। সাংবাদিকতার পাঠ নেওয়ার মধ্যেই এক পত্রিকা ডিঙিয়ে আরেক পত্রিকায় সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব। সেই পত্রিকায় তখন প্রকাশ পেতে শুরু করেছে সমরেশ মজুমদার-এর ধারাবাহিক 'হিরে বসানো সোনার ফুল'। সে লেখার লালপালন-প্রুফ সংশোধন-সম্পাদনে আরেক গুণীজন প্রীতিকণা পাল রায়। যাঁকে সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার পরবর্তী সময়ে সম্পাদনা থেকে সরিয়ে এনে সিরিয়াল-সিনেমার চিত্রনাট্যকারে পরিণত করেছেন।

সেই উপন্যাসের নায়িকা তিতির। যে সাবলম্বী হতে চায়। তারপর বসতে চায় বিয়ের পিঁড়িতে। স্বাভাবিকভাবে উপন্যাসে নানা চরিত্রের ভিড়। সুবর্ণা, তিতির, বিভাস, রঞ্জনা, সুবীর, কৃষাণু এমন অনেক। সমরেশদা লিখতে বসে চরিত্রদের নামের ক্ষেত্রে যতটা না ভুল করতেন, যেমন রঞ্জনাকে অঞ্জনা, তিতিরকে মিতির, বিভাসকে প্রভাসতার চেয়ে ঢের বেশি ভুল করতেন উপন্যাসের নাম লিখতে গিয়ে। প্রায় প্রতি মাসেই বদলে যেত উপন্যাসের প্রকৃত নাম। 'হিরে বসানো সোনার ফুল' কখনও হয়ে উঠত হিরে বসানো কানের দুল, সোনা বসানো হিরের ফুল, হিরে বসানো কানের ফুল, কানে বসানো হিরের ফুল এমন অজস্র। প্রীতিদি, ডেকে ডেকে দেখাত, এই দ্যাখ দ্যাখ, সমরেশদা কেমন উপন্যাসের নাম বদলে ফেলেন প্রতি মাসে! অনাবিল হাস্যে অফিসঘর কলকলিয়ে উঠত। অনাবিল আনন্দ হত, যখন দেখতাম, অফিসের ফোনে মাঝেমধ্যেই ফোন আসত 'সমরেশ মজুমদারের ওই হিরে বসানো না কি উপন্যাসের কিস্তিগুলো একসঙ্গে দিতে পারবেন?'

---কী দরকার?

---আমরা সিরিয়াল করব।

সত্যিই সিরিয়াল করার মতো রসদ ছিল এই উপন্যাসে। বলা ভালো, লেখক জেনেবুঝেই প্রায় চিত্রনাট্যের আকার দিয়েছিলেন উপন্যাসটিকে। আসলে, সেই সময় সমরেশদার লেখক-জীবনের চাইতেও বেশি ব্যস্ততা ছিল চিত্রনাট্যকার-জীবনে। এই শর্মাকেও পাকড়াও করেছিলেন চিত্রনাট্যকার বানিয়ে ফেলার জন্য। কিছুটা পেরেওছিলেন। কিন্তু লেগেপড়ে থাকার ইচ্ছেটুকু না থাকলে যা হয়! কতবার যে গাধার মুখে চাকরির দামি মুলো ঝুলিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু শালগ্রাম শিলা যদি না নড়ে, না যদি দু-পা হাঁটে, কার সাধ্যি!

একটিবারের কথা না বললেই নয়। সকাল সকাল গিয়েছি লেখা আনতে। শ্যামপুকুর স্ট্রিটের বাড়িতে। সমরেশদা আমার অপেক্ষায়। পৌঁছোতেই লেখাটা হাতে গুঁজে দিয়েই বললেন, গাড়িতে ওঠো।

ভাবলাম, অন্যান্যবারের মতো বুঝি আমাদের অফিসের দিকেই চলেছেন! তাই সারথী করেছেন। ও-মা! কিছু বাদেই দেখি, একটি প্রথম সারির দৈনিক সংবাদপত্রের প্রথম সারির টিভি চ্যানেলে হাজির করেছেন। গিয়েই কাকে যেন বললেন, এই যে সেই।

দুম করে পরীক্ষায় বসিয়ে দিলেন।

তার আগেই অবশ্য বলেছিলেন, চ্যানেলটির কথা। কাজের কথা। ওজনদার দক্ষিণার কথা। কিন্তু শালগ্রাম শিলা হলে যা হয় আর কী! তো, সেই হঠাৎ পরীক্ষায় হঠাৎ পাশও করে গেলাম। সাক্ষাৎকার পর্বও সেই দিনই সারা হল। চাকরি পাকা। অনেক কথার স্লোত বইয়ে দেওয়ার পরেও চাকরিতে যোগ দিলাম না। সমরেশদা হয়ে উঠলেন খেপচুরিয়াস। জারি করলেন ফতোয়া, 'তোমার মুখ দেখতে চাই না'!

সাক্ষাৎ যমরাজের ধমক। মাসকয়েক ফোনাফুনি বন্ধ। ওদিকে পুজোসংখ্যা প্রকাশের সময় এগিয়ে আসছে। সমরেশদার লেখা চাই-ই চাই। একদিন দুম করে ফোন না দিয়েই হাজির হলাম তাঁর আজীবনের আবাসস্থলে। হাতে, পুজোসংখ্যায় লেখার অনুরোধ নিয়ে চিঠি।

শুরু হল, ওই গমগমে গলার ধমক-চমক। আবার এসেছ?

যে মানুষ নিজের ভালো বোঝে না, তার জন্য আমার কোনও অনুকম্পা নেই। তার পত্রিকায় আমি লিখব না। তোমার মালিককে ফোন করতে বলো।

সেই বাজখাঁই ধমকের রেশ গিয়ে পড়ল ওপর মহলে। ধীরা বউদিকে পর্যন্ত গিয়ে নালিশ করলেন এই আমার নামে। বউদিকে গিয়ে সব বললাম। অপরাধের কথা। অমান্য করার কথা। সমরেশদার বারংবার আমাকে দিয়ে অন্য কোনও কাজে যোগ দেওয়ানোর চেষ্টার কথা।

বউদি মুচকি হেসে বললেন, সমরেশ তোমাকে উত্তরবঙ্গের তুতোভাই হিসাবে নিয়েছে।

মানে? আমি তো মেদিনীপুরের। উত্তরবঙ্গের নয়।

কাজটা তো করো উত্তরের কাগজে। তাই তুমি উত্তরের তুতোভাই। আসলে, সমরেশ যতই অন্যদের সঙ্গে ভারিক্কি মেজাজ নিয়ে কথা বলুক না কেন, উত্তরবঙ্গের কেউ এলে তাকে ও সময় দেবেই। কীভাবে তার উপকারে আসা যায়, তার চেষ্টা ও করবেই। তুমি সেই দলে।

মুখটা আলো হয়ে ওঠে। এর মাঝেই বউদি বলেন, 'তোমাদের মালিক তো সুহাসবাবু। তিনি সমরেশকে অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর পত্রিকায় লেখার কথা বলেছিলেন। তখন সমরেশ বলেছিল, উত্তরবঙ্গের হলেও ও এখন কলকাতার লেখক। জবাবে তোমাদের মালিক বলেছিলেন, সবারই তো একটা মামাবাড়ি থাকে। এই পত্রিকায় না হয় সেই মামাবাড়ির আবদার মেটাবেন। লিখতে অসুবিধে কোথায়'!

বউদির কাছে ক্ষমা চেয়ে, আপ্যায়ন পেয়ে উঠতে যাচ্ছি, আবার অমনি ধমক।

---আমি কিন্তু পুজোসংখ্যায় লিখব না, কিছুতেই লিখব না। তোমাদের মালিককে ফোন করতে বলো।

কথা সরে না মুখে। ওদিকে ধীরা বউদির গালে ঈষৎ টোলফেলা হাসি।

ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা।

অভিমানপর্ব পেরিয়ে নিজেই ফোন করে লেখা নিয়ে আসতে বলেছিলেন।

এই প্রতিবেদকের বিবাহ-পূর্ব ঘটনা এসব।

রেজিস্ট্রি আগেই সারা ছিল। কিন্তু ঘটনার ঘনঘটায় পিঁড়িতে বসে মন্ত্রোচ্চারণ করে সাতপাক খেতে পারব কিনা, এ নিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে প্রায় বঙ্গোপসাগর গুলিয়ে ফেলেছিলাম। সে বিস্তর কাহিনি। ফলে, বিয়ের কার্ড পর্যন্ত ছাপার সাহস জোটেনি। ২০০৬-এর ডিসেম্বর। ৫ তারিখে বিয়ে। দিনক্ষণ ঠিক করে সমরেশদাকে ফোন করে উঠতে পারলাম ২ ডিসেম্বর। নিমনিমে সন্ধেবেলায়। বলতেই, আকাশ থেকে পড়লেন। এবং খুব স্বাভাবিক। জিজ্ঞেস করলেন, এই তো হপ্তাখানেক আগে বাড়িতে এলে লেখা নিতে, কই তখনও তো বলনি! বিয়ের কার্ড কোথায়?

বিয়ের কার্ড পর্যন্ত ছাপাতে পারিনি জেনে সমরেশদার সে কী অট্টহাসি। সে হাসি ওই একবারই মাত্র শুনেছিলাম। আর তারপর? এককান মাছি। বলেই চলেছেন।

গন্ধর্ব মতে বিয়ে করছ নাকি? নাকি তিনি উত্তরবঙ্গের মদেশিয়া? অন্যের বউ ভাগিয়ে নিয়ে আসছ না তো? মেয়েটির মা-বাপ কি জানে? নাকি বউমা আগে থেকেই প্রেগন্যান্ট? তাই হুট করে ঝুলে পড়ছ!

এমন শান্ত-নিরীহ প্রশ্নের কি-ইবা উত্তর দেওয়া যায়! দু-কান শুধু রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। তবুও ম্রিয়মান কণ্ঠে বলি, আপনি কি কোনওভাবে বিয়েতে আসতে পারবেন দাদা?

রসিক সমরেশ দ্বিগুণ হয়ে ওঠেন।

সন্তান কোলে বউমার বিয়ে, এমন কেস নাকি!

হাজারো কথা বলতে বলতে শেষমেষ নিজেই বলে বসেন, কিন্তু তোমাদের বিয়ের দিন ৫ ডিসেম্বর তো স্ট্রাইক ডেকেছে! যাই কী করে!'

(৪)

২০০২ থেকে ২০২৩। দু-দশক ধরে এমন নানা রঙের অজস্র কথারা থরে থরে জমে আছে মনের খাঁজে। বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের কথায় ফিরি। ধীরা বউদির সাক্ষাৎকার গ্রহণের কথায়। মাঘ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭। সেদিন 'টগবগে যুবক' সমরেশদাকে দমিয়ে দিয়ে গটগট করে শ্যামপুকুর স্ট্রিটের দোতলায় উঠে যাই। অপেক্ষায় ছিলেন ধীরা বউদি। হাহা-হিহিতে ঘণ্টা দেড়েকের সাক্ষাৎপর্ব শেষ হয়। সমরেশদা তখনও গুম মেরে নীচের ঘরে বসে। নীচে নামতেই ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী বলল ধীরা? বল না!

একবার, দু-বার, তিন বার! জিজ্ঞেস করেই চলেছেন।

(৫)

সমরেশ মজুমদারের মতো বটবৃক্ষে, কীটতুল্য এই প্রতিবেদক আশ্রয় পেয়েই ধন্য। ছাপার অক্ষরে ঘরোয়া কথা ফাঁস করে তাঁকে বিব্রত করে তুলবার ইচ্ছেটুকু সেদিনও ছিল না, আজও নেই।

পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমরেশদা এই বিশেষ সংখ্যাটি নিজেই সংগ্রহ করেছিলেন জানি। তবে, কোন লেখাটি আগে পড়েছিলেন, সে বিষয়ে টুঁ শব্দটি করেননি। বুঝতে পারি, জায়া ধীরার সাক্ষাৎকার।

একটি কথা বলেই ফোন কেটে দিয়েছিলেন, 'থ্যাংক ইউ-উ-উ-উ'!

(৬)

সত্যি, যত বড়ো বীর হোক বা ধনশালী, ক্ষমতাশালী-- স্ত্রীকে কে না ভয় পায়? সমরেশও ব্যতিক্রম নন।

ব্যক্তিত্ব—

গ্রীষ্মের দুপুর আর ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

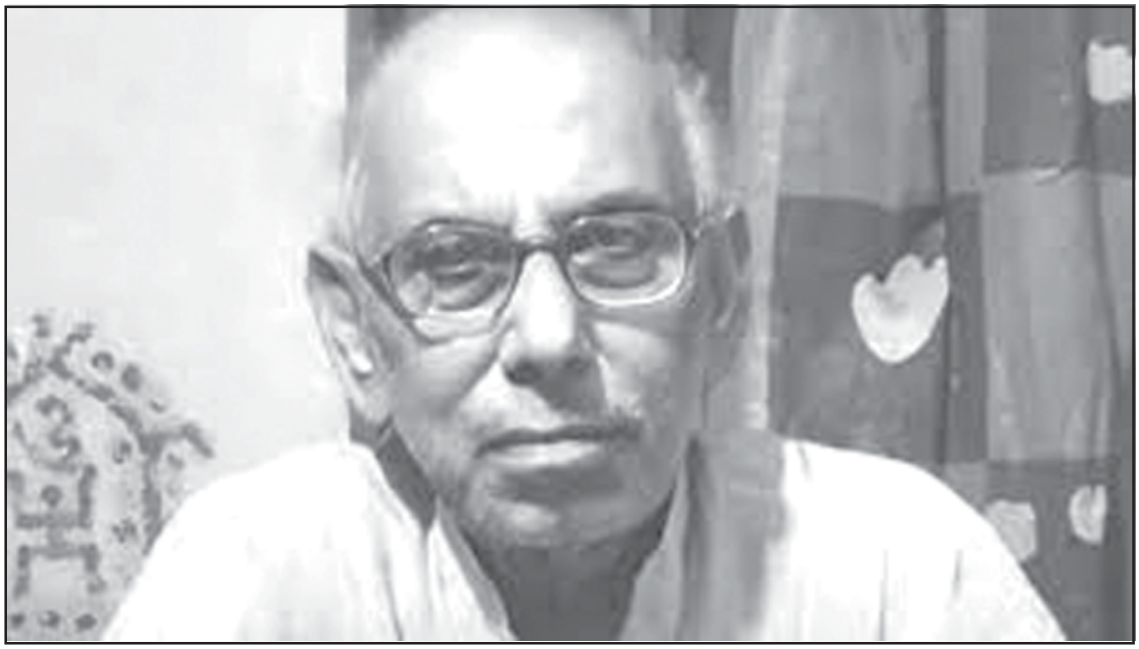

সেই সব দুপুরের কথা মনে পড়ে। তখন ছোটোবেলা। মামাবাড়ির সেই গ্রাম। চারিদিকে মাঠ আর মাঠ, গ্রাম জুড়ে বড়ো বড়ো পুকুর। মামাদের বিশাল বাড়ি। মোট সদস্য সংখ্যা ৫২জন। খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো মিলে দশ মামা, দশ মামী। তাঁদের ছেলেমেয়ে আর আমরা মাসতুতো ভাই বোনেরা। মামাদের সবাই ছিলেন স্কুল মাস্টার। কড়া শাসন বাড়িতে। তাও সবাই জুটত মামার বাড়িতেই। একসঙ্গে মানুষ হওয়া, যৌথ পরিবারের মজাটাই আলাদা। যা এখন আর পাওয়া যায় না।

মনে আছে সেই গ্রীষ্ম দুপুরের কথা। স্কুলের গরমের ছুটি। মামাদেরও ছুটি। পড়াশোনা আর বাড়ির চৌহদ্দিতে আটকে থাকা। মামা, মামীদের কড়া শাসন উপেক্ষা করার ক্ষমতা ছিল না। অথচ গ্রামীণ ঘন দুপুর আমাদের টানত। আম, জামের টান তো থাকতই তার সঙ্গে গ্রামের নিরালা দুপুরের আকর্ষণ কম ছিল না। বাড়ির সিংহ দুয়ার পার হলেই খাঁ খাঁ রোদে পড়ে থাকা গ্রাম। নিস্তব্ধ রাস্তায় লোক চলাচল নেই। ওদিকে গাছপালা ভরা বাগানগুলোতে কত রকমের পাখিদের গুঞ্জন। অথবা ক্লান্ত দুপুরে কোনও কোনও পাখি চুপচাপ বসে প্রহর গুনত। কখন দুপুর পেরিয়ে আসবে বিকাল। পুকুরগুলোর শান্ত জলে জলপোকারা আঁকিবুঁকি কেটে যেত। সেই পুকুর আমাদের টানত। একবার বের হতে পারলেই খোলাম কুচি নিয়ে পুকুরের জলে ব্যাঙবাজির মজা। কিন্তু বাড়িতে ছিল কড়া শাসন।

আমাদের মতিগতি বুঝে মামা ও মামীরা প্ল্যান খাটালো। দোতলার ঘর লাইব্রেরিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হল একদিন আমাদের। যাতে চোখের আড়াল দিয়ে বাইরে কেউ বের হতে না পারি। মামারবাড়ির বিশাল ঘরোয়া লাইব্রেরিটায় বইয়ের যেন শেষ ছিল না। মামীরা আমাদের বেছে বেছে হাতে বই তুলে দিতেন। সেই প্রথম হাতে পেয়েছিলাম 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'র প্রথম খণ্ড। পড়ার পরই মন মুগ্ধ হয়ে গেল। এক এক করে অনেকগুলো পড়ার পর চোখ আটকে গেল লেখকের নামে। তাঁর ছবিতে। সেই প্রথম বইয়ের মাধ্যমে আলাপ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কোনওদিন চোখে দেখব ভাবিনি।

লেখকের বই ভালো লাগলেই লেখককে নিয়ে স্বপ্ন আসে। গ্রামীণ দুপুরে যে মাদকতা আমাদের বাইরে চুম্বকের মতো টানত, সেই টান ক্রমে কমে এল। আমরা গ্রীষ্মের দুপুরে পাণ্ডব গোয়েন্দায় আটকে গেলাম। অতগুলো ভাইবোন সারা দুপুর কাটিয়ে দিতে লাগলাম একসঙ্গে। সবার হাতে আর বই

নেই। শেষ পর্যন্ত আমাদের চেয়ে যে দাদা বড়ো ছিল, সেই পড়া আরম্ভ করল। সারাটা দুপুর বাবলু, বিলুদের সঙ্গে আমরাও মনে মনে অ্যাডভেঞ্চারে মেতে উঠলাম। গ্রাম্য দুপুরে বাইরে বের না হতে পারার মন খারাপটা পুষিয়ে দিয়েছিল পাণ্ডব গোয়েন্দার স্রষ্টা ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়। তারপর কোথা দিয়ে ছোটোবেলা হুট করে কেটে গিয়ে বড়বেলা এসে গেল।

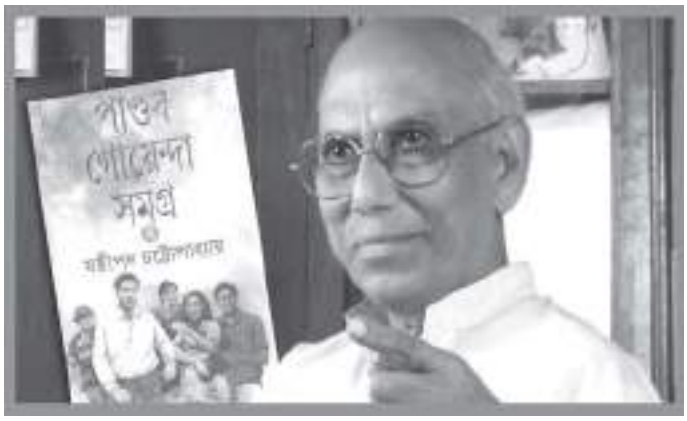

একদিন সত্যিই লেখকের সঙ্গে পরিচয় হল। দারুণ মানুষ, একেবারে অহঙ্কারহীন। কত কিছু জানতেন, জ্ঞানের পরিধি ছিল বিশাল। অথচ কথাহীন হয়ে থাকতেন। যেন কিছুই জানেন না। গভীরভাবে মিশতে মিশতে একদিন একেবারে আপনজন হয়ে যাওয়া। কেটে গেল বহু বছর।

ছোটোবেলার দুপুরের সেই মনখারাপটা আবার এল ২রা মার্চ। এদিনই চলে গেলেন আমার প্রিয় লেখক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়। এদিন দুপুরটা অদ্ভুতভাবে ডেকে নিয়ে এল ছোটোবেলার মনখারাপটাকে। এই শহুরে জীবনে কড়া রোদে অনেক কিছুকেই ছাপিয়ে তাঁর মেলামেশার কথা মনে এল। সেই সব দিনে কাহিনিগুলো যে অনুভব এনেছিল সেই অনুভবই যেন ফিরিয়ে আনল। ওই তো রেলিংয়ের ওপর বসে রোদে পুড়তে পুড়তে কাকটা কা কা করে মারাত্মক বিষণ্ণতা ছড়িয়ে দিচ্ছে দুপুরের পরিবেশে। শহর তাই প্রাণচঞ্চল। তা হলেও অদৃশ্যভাবে শহুরে জীবনের মধ্যে নিরালা দুপুর তৈরি হল যেন। কোথা থেকে একরাশ মনখারাপ করা দুপুরের বাতাস ঘিরে ধরল। হা হা করা এক শূন্যতা বুকের মধ্যিখানে মোচড় তুলল। মানুষটা চলে গেলেন। হাজারো স্মৃতি নিঃশব্দে পড়ে রইল মনের একলা ঘরে। সেই ছেলেবেলার পাঁচ চরিত্র আর কানা পঞ্চু যেন ফিরে এল স্মৃতির দুয়ারে। ঠিক তখনই আমার বারান্দার নীচে যে কুকুরটা শুয়ে থাকে তার ভৌ ভৌ আওয়াজ ভেসে এল। অদ্ভুত এক মিলমিশ। মনটা ছিন্নভিন্ন করে দিল। যা হারায় তা ফেরে না তবে মনের অন্দরে কোথায় যেন রয়ে গেল সোনালি ছেলেবেলা।

ব্যক্তিত্ব—

ননসেন্স রাজ্যে অবিসংবাদী সত্যজিৎ রায়

হাননান আহসান

'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম' আদ্যোপান্ত একটি ননসেন্স ছড়ার বই। মুচমুচে আর লোভনীয় এই বইয়ের লেখক সত্যজিৎ রায়। মজার ব্যাপার, লুইস ক্যারল, এডওয়ার্ড লিয়র, ভার্মি টমসন ও হিলেয়ার বেলকের কিছু লেখার অনুবাদকর্ম এটি।

আমরা জানি, সত্যজিৎ রায় মৌলিক গল্পের পাশাপাশি নিজস্ব ঢঙে বেশ কিছু অনুবাদও করেছেন। আর 'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম' তার-ই এক সোনালি ফসল যা আপামর শিক্ষিত বাঙালি পাঠকের কাছে সাত রাজার ধন এক মানিকের মতো।

বইটিতে মোট সাতটি অনূদিত ছড়া ও একটি গল্প জায়গা পেয়েছে। বিষয়গুলি এইরকম---

পাপাঙ্গুল (The Jumlies অবলম্বনে), ডং (The dong with a luminous nose অবলম্বনে), লিমেরিক, পিপলি বিলের ধারের সাতটি পরিবারের ইতিকথা, জবরখাকি, রামপাগলের গান (A mad Gardener's song অবলম্বনে), মেছো গান, আদ্যি বুড়োর পদ্যি (The white knight's song অবলম্বনে), হেসরি কিং-এর অকালমৃত্যু (হিলেয়ার বেলকের হেনরিকিং অবলম্বনে), তিন ভিখিরি (ভার্মি টমসনের থ্রি পুওর বেগারমেন অবলম্বনে)। যাঁরা বইটি পড়েছেন তাঁরা জানেন, 'পিপলি বিলের ধারের সাতটি পরিবারের ইতিকথা' ছাড়া অন্যগুলো শুধুই ছড়া। তবে মজার ঘটনা যেটা, তা হল ছড়াগুলো অনুবাদ করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু এগুলি ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ নয়। একেবারে মুখাবয়ব বদলে দিয়ে সত্যজিতের নিজের ছাঁচে তৈরি গরম গরম পাঁপড় ভাজা। সুকুমারপুত্র কিন্তু ভুলে যাননি মূল কবির কথা, তাঁদের সামনে বসিয়ে রেখে চিত্রশিল্পীর মতো নিখুঁত ছবি এঁকে গিয়েছেন। অর্থাৎ রস-গন্ধ বজায় রেখে বিশ্বের দুই খেয়ালরসিক এডওয়ার্ড লিয়র ও ল্যুইস ক্যারলের মজার আজগুবি ছড়ার জগতকে নিজের কল্পনার রঙে রাঙিয়ে নতুন করে পরিবেশন করেছেন সত্যজিৎ। ছোটোরা তো বটেই বড়োরাও চেটেপুটে সাবাড় করবে এই ঘোড়ার ডিম। এ স্বাদের ভাগ হবে না, একেবারে জিয়নকাঠির মোড়কে তৈরি। নিখুঁত নিটোল। মনে রাখতে হবে, শুধু ঘোড়ার ডিম নয়, 'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম'!

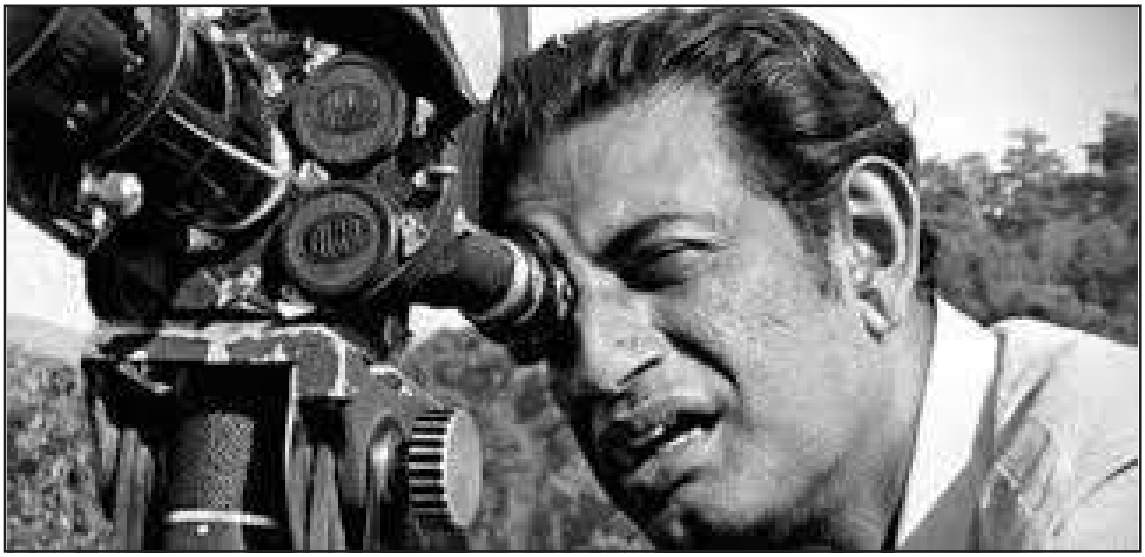

'আবোল তাবোল'-এর শেষ কবিতায় বলাবাহুল্য সুকুমার রায়েরও শেষ রচনায়, এই পঙক্তিগুলি যত সংক্ষেপে ধরা হয়েছিল আজগুবি দুনিয়ার মেজাজকে, তার তুলনা মেলা ভার। সুকুমারের আবোল তাবোলের সেই বিদায়ী করুণ সুরটি পাঠক মনে করতে পারেন---

'আদিম কালের চাঁদিম হিম,
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।

ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর।'

আবোল তাবোল-এর ধারাবাহিকতার সুর ধরে রাখার জন্যই হয়তো সত্যজিৎ বইয়ের নামটাও পিতার কাছ থেকে ধার করেছেন। সন্দেহ নেই, বিশ্বের সেরা দুই খেয়ালরসিক লিয়র ও ক্যারলের বেয়াড়া ও সৃষ্টিছাড়া, নিয়মহীন ও হিসেবহারা আজগুবি জগকে নিজস্ব কল্পনার ছাঁচে ঢালাই করে বাংলা ননসেন্স জগতকে নতুন করে রাঙিয়ে দিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। আবারও বলতে হয়, তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম যতটা না অনুবাদ ঠিক ততটাই কবির অনুভবের উজ্জ্বল অনুসঙ্গ। ধরুন, সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল কেউ অনুবাদ করতে চাইছেন, কল্পনা করুন তার অবস্থাখানা কেমন হবে। ওই 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'-মতো।

লিয়রের লিমেরিক আর ক্যারলের ননসেন্সও তাই। আক্ষরিক অনুবাদ করা কঠিন তবে অসম্ভব আজগুবি দুনিয়ার রসদ ও রহস্যময় আনকোরা শব্দের দ্যোতনায়, হিজিবিজবিজদের কাণ্ডকারখানা যখন আমাদের মনের জগতকে নাড়িয়ে দেয়, লিয়রের স্কেচ থেকেই তখন জন্ম নেয় নতুন লিমেরিক; ক্যারলের লেখা আর স্যার জন টেনিয়েলের ছবি জুড়ে দিয়ে নতুন সৃষ্টিতে মেতে উঠতে। রক্তে যাঁর সুকুমার রায়ের উত্তরাধিকার, নিজে যিনি স্বপনঘোড়ার চড়নদার, সেই সত্যজিৎ রায় যেমন অনায়াসে এর আগে 'আবোল তাবোল'- এর কয়েকটি কবিতাকে রূপান্তরিত করেছেন ইংরিজিতে, তেমনই স্বচ্ছন্দে ইংরিজি ননসেন্সকে বাংলা সাহিত্যের অন্দরমহলেও নিয়ে আসেন। তোড়ায় বাঁধার লেখাগুলি যতখানি লিয়রের, ক্যারলের বা বেলকের, ততখানিই সত্যজিতের।

বাংলায় অর্থ-অপ্রধান সাহিত্য বা ননসেন্স ধারাকে জনপ্রিয় করেছেন সুকুমার রায়। আর তাঁরই সুযোগ্যপুত্র সত্যজিৎ রায় পশ্চিমের অসাধারণ কিছু ননসেন্সকে অনুবাদের মতো বড়ো একটি কাজ করে গিয়েছেন। অবশ্য মূল ভাব নিয়ে তিনি নিজের মতো করে লিখেছেন সেটা বইয়ের শুরুতে জানিয়েও দিয়েছেন। লিয়র লিখেছেন অসংখ্য লিমেরিক, মানে পাঁচ বাক্যের ছড়া সঙ্গে এঁকেছেন ছবি। সত্যজিৎ সেই ছবিগুলো রেখে আনকোরা বাংলায় রূপান্তর করেছেন অদ্ভুত কিছু লিমেরিক। লিয়র'র ছড়াগুলির বিষয়বস্তু ননসেন্স হলেও এর গঠন, ছাঁচকে আমরা লিমেরিক বলছি। প্রতিটি ছড়াই সাকুল্যে পাঁচ লাইনের। মিলগুলি এইরকম : ১+২+৫ আর ২+৩ মানে অন্তমিলের কারুকাজ হল প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম লাইন বা পঙক্তির সঙ্গে তৃতীয় ও চতুর্থ পঙক্তির অন্তমিল। খেয়াল রাখা জরুরি, তৃতীয় ও চতুর্থ পঙক্তি কিন্তু প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম পঙক্তির চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোটো। লিমেরিক রচনার ক্ষেত্রে ছন্দের এই অনুশাসনের কাছে পুরোপুরি দায়বদ্ধ থেকেছেন সত্যজিৎ। সুকুমারপুত্র এতটাই নিখুঁত যে কোথাও ছন্দের কোনো স্খলন বা পতন চোখে পড়ে না। লিয়রের jumblies অবলম্বনে পাপাঙ্গুল, কিংবা ডং উইথ লুমিনাস নোজ এর যে বিস্ময়কর অনুবাদ তিনি করেছেন সেগুলো মৌলিক বলাই ভালো। লুইস ক্যারলের বিখ্যাত জবরওয়াকি সহ বেশ কয়েকটা ছড়ার অনুবাদও একইভাবে তিনি করেছেন। এখানে সবিনয়ে উল্লেখ করা যায় যে, সংস্কৃত সাহিত্যে উদ্ভট রসের কবিতা বহাল তবিয়তে জায়গা নিয়ে রয়েছে। আমরা পূর্ণচন্দ্র দে-কে (১৮৫৭-১৯৪৬) জানি, যিনি সংস্কৃতের উদ্ভট কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। তবে সুকুমার রায় কিন্তু এই গোত্রের লেখার পথিকৃৎ। তাঁর আবোল তাবোল গ্রন্থের 'খিচুড়ি' পদ্যটি একেবারে উদ্ভট রস ও আনকোরা মজায় ভরপুর। রবীন্দ্রনাথও 'খাপছাড়া'-য় উদ্ভট রসের আমদানি করেছেন। তবে আমাদের মনে হয় সুকুমারকে তিনি পেরোতে পারেননি। অর্থাৎ সুকুমারই এ বিষয়ে একমেবাদ্বিতীয়ম।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের ওয়েস্টমিনস্টারের ছাত্ররা একটি ননসেন্স ক্লাবের স্বপ্ন দেখেছিলেন রঙ্গ-রসিকতার মোড়কে। কিন্তু সেসব ছিল কৌতুক ও সময় অসময়ের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ এবং আদিরসের উচ্চকিত চর্চা। চার্লস চার্চিল, উইলিয়াম কাউপার, নাট্যকার জর্জ কলম্যান, উইলিয়াম গোহার্ট এই ক্লাবের উজ্জ্বলতম সদস্য ছিলেন। ভাবার বিষয় এই যে আমাদের সুকুমার রায় কিন্তু এদেশে ননসেন্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়ার সময়ে তিনি বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে একটি ননসেন্স ক্লাব তৈরি করেন। বলাবাহুল্য, সেই ক্লাব নিয়ে আমাদের চর্চা নেই বললেই চলে। বাঙালি বরাবরই বিস্মৃত জাতি, অতীত ভুলে গিয়ে বর্তমানের দোলায় চড়ে উড়োজাহাজের কল্পনা করে। কিন্তু রায়চৌধুরী পরিবারের উপেন্দ্রকিশোর আর ঠাকুর পরিবারের অবনীন্দ্রনাথ শিশুসাহিত্যের যে ধারাকে বহন করেছিলেন, পরবর্তীকালে সুকুমার ও সত্যজিৎ তা সুচারুভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। বরাবরই উদ্ভট ও অবাস্তবের দিকে সুকুমার-সত্যজিতের ঝোঁক ছিল। 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সেই ধারা প্রবাহিত হয়েছে। সুকুমারের ননসেন্স ক্লাবের মোটো ছিল---'যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব তাহা লইয়াই ক্লাবের

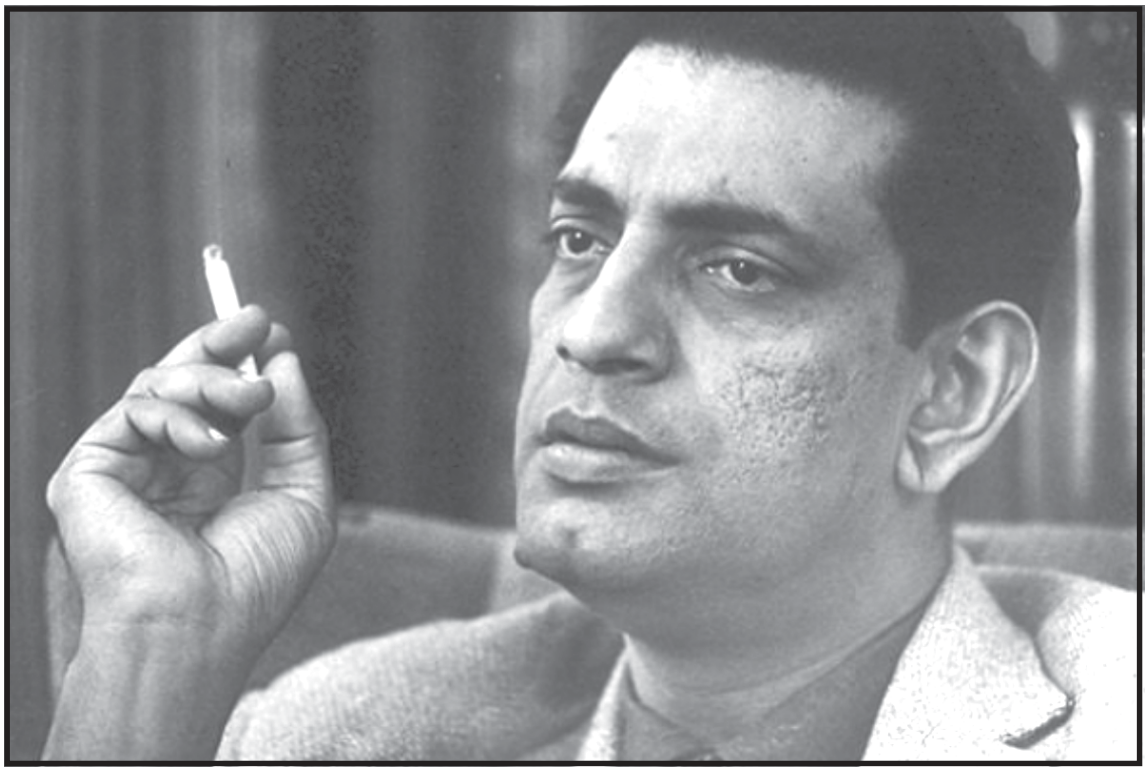

কারবার। সুতরাং সে রস যাঁরা অনুভব করতে পারেন না এই ক্লাব তাহাদের জন্য নহে।'

ননসেন্স এর মানে কিন্তু 'নেই-সেন্স' নয়। এটা একরকম 'অ-মানুষিক' সেন্স, যেটার অর্থ বোঝাতে গেলে বক্তা এবং শ্রোতা দু'জনকেই খানিকটা হলদে-সবুজ ওরাং-ওটাং হতে হবে। কিন্তু, আজকাল এরকম অ-মানুষদের চট করে দেখা পাওয়াই মুশকিল! আমরা যে কত বড়ো ভাগ্যবান সুকুমার রায় বাংলায় ননসেন্স পদ্য লিখতেন! একবার ভেবে দেখুন তো, কেউ যদি সুকুমারকে ইংরিজি ভাষায় লেখার চেষ্টা করতেন, তাহলে তিনি ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে যেতেন। সুকুমারের লেখার প্রকৃত অর্থ, রস, রোমাঞ্চ, মজা ঠিকঠাক উপহার দেওয়া যেত? অনেক হাঙ্গামা করে কেউ যদি অনুবাদ করেও ফেলত, তাহলে ছন্দের দুলুনিটা আসত কি? ভাবতে ভাবতে ঘুম ছুটে যেতে পারে। একটা উদাহরণ সামনে রাখা যাক। এই যেমন অ্যালিস ইন দ্য ওয়ান্ডারল্যান্ড-এর লেখক লুইস ক্যারলের লেখা বিখ্যাত সেই ইংরিজি ননসেন্স পদ্য। একটু পড়ে নিতে পারেন---

And, as in uffish thought he stood,
The Jabberwock, with eyes of flame,
Came whiffling through the tulgey wood,
And burbled as it came!
One, two! One, two! And through and through
The vorpal blade went snicker-snack!
He left it dead, and with its head
He went galumphing back.

কী মুশকিল! এ যে আমাদের সুকুমারের মতোই ব্যাপার। এখানেও দেখি ছেঁচকি শাকের ঘণ্ট ঢুকে রয়েছে। এই জিনিসের অর্থ বাংলায় অনুবাদ করে আমাদের মতো মুখ্যুদের বোঝানো তো স্বয়ং কুমড়োপটাশেরও অসাধ্য! হুঁ হুঁ বাবা। এবার দেখুন সেই সুকুমারপুত্র সত্যজিতের ভেলকি---

'এমন সময় দেখতে পেল চেয়ে
ঘুলি্চ বনে চুল্লি-চোখের ভাঁটা
জবরখাকি আসছে বুঝি ধেয়ে
হিলফিলিয়ে মস্ত করে হাঁ-টা।

সনসনসন চলল তরবারি।
সানিক্ সিনিক্ জবরখাকি শেষ।
স্কন্ধে নিয়ে মুণ্ডখানা তারই
গালুস্ফিয়ে যায় সে আপন দেশ।'

এরকম গণ্ডা গণ্ডা ইংরিজি ননসেন্সকে সত্যজিৎ বাংলায় রূপান্তর করেছেন। তারপর সেই ঘোড়ার ডিমগুলোকে সযত্নে তোড়ায় বেঁধে আমাদের উপহার দিয়েছেন। যারা একটু হলেও নিজেদের মধ্যে হলদে-সবুজ ওরাং-ওটাং-কে খুঁজে পায়, তাদের জন্য যে এটা কতবড় উপহার, সেই কথা ভাবতে গিয়ে যে কেউ ইট-পাটকেল চিৎ-পটাং হয়ে যাবে! আসলে সত্যজিতের এই ননসেন্স ছড়া লেখার ঝোঁক একদিনে আসেনি, পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তা তিনি অর্জন করেছিলেন। সত্যজিতের অনুবাদ অবশ্যই শব্দপ্রয়োগের ছান্দসিক অথবা অনিবার্য ভাবার্থের বাক্যবিন্যাস। একজন প্রকৃত কবির আবেগ-অনুভূতি, উপলব্ধি ও চিন্তনের সংক্ষিপ্ত রূপ। অন্যধারে, অবশ্যই উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প সৃষ্টির মহৎ উদাহরণ। সত্যজিতের অনুবাদ তাই সবসময় অর্থবোধক না হয়ে দ্যোতনাযুক্ত হয়ে উঠেছে।

একবার বিদেশে কোথাও যাওয়ার সময় বিমানবন্দরে ফ্লাইটের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন সত্যজিৎ। হাতে বিস্তর ফাঁকা সময় ছিল, 'সন্দেশ'-এর পরবর্তী সংখ্যার জন্য কিছু একটা লিখবেন মনে করে নিছক খেয়ালের বশে এই পদ্যগুলো অনুবাদ করেছিলেন তিনি। ভাগ্যিস করেছিলেন! নইলে কি আর জানতে পারতুম যে---

'পাগলা গোরু সামলানো যা ঝক্কি,
আমার কথা শুনবে কোনো লোক কি?
কাছে যখন পড়বে এসে
বলবে তারে মিষ্টি হেসে,
'আমার ওপর রাগ কোরো না লক্ষ্মী !'

বাংলা ভাষার খেয়ালরসের একচ্ছত্র অধিপতি সুকুমার রায়। তাঁর উদ্ভট লেখাগুলো ছোটোদের জন্য হলেও বড়োরাও বেশ মজা করে এসব পড়েন। সে রকম বিশ্বের সেরা ২জন খেয়ালরসিক এডওয়ার্ড লিয়র আর লুইস ক্যারল। সুকুমার রায়ের মতোই তাঁরাও ছড়ায় ছড়ায় গড়েছেন আজব আর উদ্ভট সব জগৎ। তাঁদের সেই জগতের সঙ্গে আমাদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সুকুমারপুত্র সত্যজিৎ রায়।

গোয়েন্দা ফেলুদা, বিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কু কিংবা গল্পবাজ তাড়িনী খুড়ো বাংলা ভাষার ছোটো-বড়ো সব পাঠকের কাছেই অতিপরিচিত নাম। এই জনপ্রিয় চরিত্রগুলোর স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়। কাছের মানুষেরা তাকে ডাকতেন মানিক নামে। তিনি শুধু লেখকই ছিলেন না, একাধারে তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পী, চলচ্চিত্রনির্মাতা। এছাড়া ছোটোগল্পও লিখেছেন প্রচুর। আর তার বেশিরভাগই শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা। মৌলিক গল্পের পাশাপাশি বেশ কিছু অনুবাদও করেছেন সত্যজিৎ। সত্যজিতের এই অনুবাদগুলো প্রকাশিত হয়েছিল শিশু-কিশোরদের একসময়ের তুমুল জনপ্রিয় সন্দেশ পত্রিকায়। সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব সৃষ্টি মজার ছড়াগুলো ছোটোদের সামনে খুলে দেবে আজগুবি এক জগৎ। যে জগৎ বড্ড বেয়াড়া আর সৃষ্টিছাড়া। আর পড়তে বসলে হাসতে হাসতে পেটে খিল লেগে যাবে। তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন সত্যজিৎ রায় নিজেই। আর বইয়ের ভেতরের অলংকরণগুলো ইংরিজি মূল বই থেকে নেওয়া হয়েছে। যেগুলো এঁকেছিলেন স্যার জন টেনিয়েল আর এডওয়ার্ড লিয়র। ছবিগুলো প্রতিটি ছড়া ও গল্পকে আরো চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

ক্যারলের লেখা আর স্যার জন টেনিয়েলের ছবি প্রাণিত করে প্রায়-নতুন সৃষ্টিতে মেতে উঠেছিলেন সত্যজিৎ। বিশুদ্ধ ননসেন্স রচনা করেও পিতা-পুত্র দুই বাঙালি লেখক কৌতুকরসের অফুরন্ত ধারার মধ্যে ছুঁয়ে যান সূক্ষ্ম সেই তন্ত্রী, সেখানে সমাজ সংসারের হিপোক্রিসির কাঁপন লাগে। প্রথম পড়ায় শুধুই মজা, দ্বিতীয় পাঠে সামান্য অস্বস্তি, আর ক্রমশ উন্মোচিত হতে থাকে চমক, হাসি সেখানে নিতান্ত মজাতেই শেষ হয় না। বুদ্ধদেব বসুর একদা মনে হয়েছিল বাংলা সাহিত্যে রায়চৌধুরী পরিবারের যেন মৌরসী-পাট্টা। সে-কথা আরেকবার প্রমাণ করবে এই বই। ফেলুদা আর শঙ্কু স্রষ্টার বিচিত্রগামী প্রতিভার ননসেন্স-রাজ্যে অবিসংবাদী অধিকারের বিচ্ছিন্ন পরিচয় পত্র-পত্রিকার পাতাতেই এতকাল ছড়িয়ে ছিল। তোড়োয় বাঁধার এই প্রথম প্রয়াস নিঃসংশয়ে এক ঐতিহাসিক ঘটনারূপে গণ্য হবে।

তথ্যঋণ

১) খেয়ালরসের সত্যজিৎ - দীপ মুখোপাধ্যায়
২) সত্যজিৎ রায় - উজ্জ্বল চক্রবর্তী
৩) সন্দেশের দিনগুলি - প্রণব মুখোপাধ্যায়
৪) অদ্বিতীয় সত্যজিৎ - মঞ্জিল সেন
৫) এক্ষণ - সম্পাদক নির্মাল্য আচার্য
৬) তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম - মাশুদুল হক
৭) মহারাজা তোমারে সেলাম - মুহাম্মাদ আলতামিশ নাবিল
৪) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও আলোচনা

বিশেষ রচনা—

চেনা মানুষ অজানা কথা

কর্পোরেট জগতে কাজের সূত্রে রাজনীতিবিদ থেকে শিল্পপতি নানাধরনের মানুষের কাছাকাছি এসেছেন, তাঁদের নিয়ে কিছু অজানা কথা এখানে তুলে ধরলেন। ***কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট মানসকুমার ঠাকুর।***

দেশে ও বিদেশে কৌটিল্য ছিলেন প্রণব মুখার্জি

দেশে ও বিদেশে কৌটিল্য নামে পরিচিত ছিলেন প্রণব মুখার্জি। ওঁর সঙ্গে আমার কতবার কথোপকথন হয়েছে তা বলা মুশকিল। আমার হিসেবে অন্তত ৩০বারের বেশি। তাঁকে নিয়ে লিখতে গিয়ে আজ অনেক কথা মনে পড়ছে। ২০০৪ সালে ভোটে জিতে আমি পূর্ব ভারতের সদস্য হলাম (আইসিএআই)। তখন আমার ক্ষমতা অনুযায়ী খুঁজতে লাগলাম এমন কোনো মন্ত্রী বা সরকারি আধিকারিক যাঁর সঙ্গে আমার জানাশোনা রয়েছে। প্রথমেই মনে পড়ে দাদার বন্ধু ও আমার খুব কাছের মানুষ মুক্তিদার (মুক্তি ধর) কথা। যাঁর সঙ্গে প্রণব মুখার্জির খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। সেই থেকে যতবার প্রণব মুখার্জির সঙ্গে দেখা করেছি উনি আমাকে মুক্তির ভাই বলতেন। ২০০৪-২০০৭ সালে জঙ্গিপুরে প্রণব মুখার্জির সঙ্গে বেশ কয়েকবার আমার দেখা করিয়ে দেন মুক্তিদা। তখন বুঝেছিলাম শুধু কাউন্সিল সদস্য হলে হবে না, দরকার বড়ো পদ। ২০০৭ সালে ফের ভোটে লড়লাম ও আইসিএআই-র সেক্রেটারি হলাম। চেয়ারম্যান হন কে কে সরকার। সর্বভারতীয় সভাপতি হন দিল্লি থেকে চন্দ্র ওয়াধার। আমার বেশ মনে আছে, ওই সময় সভাপতির এক অনুষ্ঠানে প্রণব মুখার্জিকে প্রধান অতিথি করার কথা ভাবা হয়। আর তার ব্যবস্থার দায়িত্ব পড়ে আমার ওপর। এটাই ছিল আমার টাস্ক। আমি সেই চেষ্টা করি। ওই সময় আমাদের সংস্থার যিনি সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন (আমার বিরোধীপক্ষ), উনি আচমকা প্রচার করে দেন এটা মানসের কাজ নয়। প্রণব মুখার্জি তখন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। মুক্তিদার মাধ্যমে প্রদ্যুৎ গুহর সঙ্গে আমার খুব ভালো পরিচয় ছিল। আর প্রদ্যুৎ গুহ ছিলেন প্রণব মুখার্জির ব্যক্তিগত সচিব। যাই হোক, অনুষ্ঠানের দিন আমি নিজে প্রণব মুখার্জির ঢাকুরিয়ার বাড়িতে যাই। উনি তখন পিয়ারলেস ইন-এর (যেখানে তাঁর অনুষ্ঠান ছিল) দিকে রওনা দিচ্ছিলেন। আমায় দেখে বলেন, 'এই যে মুক্তির ভাই আমার সঙ্গে গাড়িতে এস'। আমি আকাশ থেকে পড়লাম। দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলে কথা! তাঁর সঙ্গে আমি এক গাড়িতে পাশাপাশি বসে। মাঝে শুধু একটা বালিশ। আমাদের অনুষ্ঠানে আসার সময় উনি গাড়িতে জানতে চান, কী কী বলতে হবে। মজার কথা গাড়িটা যখন পিয়ারলেস ইন-এ ঢুকছে তখন আমাদের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতির চোখ ছানাবড়া! এই মজা বেশ উপভোগ করি। এরপর প্রোটোকল অনুসারে আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি প্রণব মুখার্জিকে নিয়ে অনুষ্ঠানে চলে যান। আমি পড়ে থাকলাম। ওদিকে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। আচমকা আমাদের সভাপতি কাছে এসে বলেন, মানস তুমি একটু বলে দাও আমাদের দিল্লিতে অনুষ্ঠানের জন্য। আমি বললাম, স্যার আপনি পাশে বসে রয়েছেন। আপনি বলুন, পরে আমি বলে দেব। ওই অনুষ্ঠানে প্রণব মুখার্জি বলেন, কস্ট অ্যাকাউন্টিং এমন এক পেশা যার সঠিক প্রয়োগ করলে ভারতের মতো গরীব দেশ আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হবে। আর একটা কথা খুব মনে পড়ে। ২০০৯ সালে ভারত সরকারের দু'বার বাজেট হয়। আমি যখন জঙ্গিপুরে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তখন উনি আমাকে বলেন, 'শুধু পদ নিয়ে বসে থাকলে হয় না, কাজ করতে হয়। প্রফেশনটা দেখো যাতে সমাজের কল্যাণে কাজে লাগানো যায়'। ওঁর কথা শুনে অবাক হই। বাইরে এসে প্রদ্যুৎদাকে প্রশ্ন করলাম,

কী হয়েছে? তখন প্রদ্যুৎদা বলেন, তোদের প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের সর্বভারতীয় সভাপতি এসে এক্সাইজ অডিট নিয়ে কথা বলেছিলেন। ওরা কত রিসার্চ করেছে যাতে সরকার বা শিল্পের কাজে লাগে। বলাবাহুল্য, তখন এক্সাইজ অডিট শুধু কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টরা করতে পারতেন। বাড়ি ফিরে এসে ওই সময়ের সভাপতি কুণাল ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলি। সর্বভারতীয় সভাপতি কুণাল ব্যানার্জি আইসিএআইএ-র সদস্যদের বলেন, সিএরা চাইতেই পারে কিন্তু কোনোদিন এক্সাইজ অডিট করতে পারবে না। কিন্তু ১৫ দিনের মধ্যে যখন প্রণব মুখার্জি বাজেট পেশ করেন, তখন দেখা গেল এক্সাইজ অডিট শুধু আমাদের পেশার লোকেরা নয়, সিএ-রাও করতে পারবেন। দু'টো ইনস্টিটিউটের সভাপতির মধ্যে একটা সমঝোতা হয়। পরের মিটিংয়ে আমি প্রণব মুখার্জিকে প্রশ্ন করেছিলাম, এটা কেন করলেন? তাঁর জবাব ছিল, 'আমার কাছে আগে দেশ, সমাজ। তারপর ব্যক্তি'।

নিয়ম অনুসারে একদিন সংস্থার পূর্ব ভারতের সভাপতি হলাম। তখন প্রণব মুখার্জি ভারতের রাষ্ট্রপতি। কোনও অনুষ্ঠানে তাঁকে আনা সহজ নয়। ২০১৭ সালের ২২ মে আমার বাবা প্রয়াত হন। প্রদ্যুৎ গুহ পরের দিন আমাকে সমবেদনা জানিয়ে ফোন করেন। তখন আমি প্রদ্যুৎদাকে বলি, দাদার সঙ্গে (প্রণব মুখার্জি) আমার বাবার প্রয়াণের কথা শেয়ার করা হল না। তখন প্রদ্যুৎদা আমায় বলেন, জুন মাসের শেষে দাদা কলকাতায় আসবেন, তোরা রেডি থাক। জুনের শেষ সপ্তাহে আমরা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল কনফারেন্স করি। সেখানে ছিলেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি, রাজ্যের ওই সময়ের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী আর ওই সময়ের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাম মেঘওয়াল। আমার মনের ইচ্ছা সেদিন প্রদ্যুৎদা পূরণ করেন।

প্রণব মুখার্জিকে বলা হত সংকটত্রাতা। যে কোনও সমস্যার সমাধানে তিনি ছিলেন মধুসূদন। ১৯৮৪ সালে, যুক্তরাজ্যের ইউরোমানি পত্রিকার এক সমীক্ষায় তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ৫ অর্থমন্ত্রীর অন্যতম হিসাবে বিবেচিত হন। দেশের প্রতি অবদানের জন্য তাঁকে ভারতের সর্বোচ্চ আর দ্বিতীয় অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন ও পদ্মভূষণ দেওয়া হয়।

প্রণব মুখার্জির কেরিয়ার শুরু শিক্ষকতা দিয়ে। পরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। কিছুদিন সাংবাদিকতাও করেন। ইন্দিরা গান্ধীর হাত ধরে ১৯৬৩ সালে রাজ্যসভার সাংসদ হন। তাঁর হবি ছিল বই পড়া। একসঙ্গে ৩টে বই পড়তে পারতেন। মঙ্গলবার ছাড়া তাঁর খাবারের তালিকায় থাকত আপেল, মাছের ঝোল ও সাদা ভাত। প্রতিবার পুজোয় নিজের জেলা বীরভূমে আসতেন। খুব ঠান্ডা মাথার মানুষ ছিলেন। ৪০ বছর ধরে ডায়েরি লেখেন আর বলে যান তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশ করতে। রোজ রাতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতেন শুয়ে শুয়ে।

প্রণব মুখার্জি বারবার একটা কথা বলতেন, পৃথিবীর মাত্র কয়েকটি দেশে কস্ট কনসেপ্টকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়। কোনো জিনিসের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের জন্য পণ্যের কস্ট ম্যানেজমেন্ট জানা খুব জরুরি। কিন্তু দুর্ভাগ্য এটা সব জায়গায় করা হয় না। দেশের সামাজিক-আর্থিক পরিকল্পনা আর উন্নয়নের জন্য কস্ট ম্যানেজমেন্ট খুব দরকার। প্রণব মুখার্জি যেখানেই থাকুন, ভালো থাকুন। আমার প্রণাম রইল।

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো সজ্জন মানুষ কম দেখেছি

সময়টা ২০০৭ সালের প্রথম দিকে। তখন আমি ইস্টার্ন ইন্ডিয়া রিজিওনাল কাউন্সিল (আইসিএ)-এর সেক্রেটারি। ওই সময়ে চেয়ারম্যান ছিলেন কে কে সরকার। উনি একদিন বায়না ধরলেন, 'মানস আমাদের কনফারেন্সে প্রণব মুখার্জিকে চাই।' সেই সুবাদে আমি কথা বলতে দিল্লি যাই। তখন প্রণব মুখার্জি পররাষ্ট্র দফতরের মন্ত্রী। দিল্লিতেওনার অফিসে বসে রয়েছি। কিছুক্ষণ পরে আমার ডাক পড়ল। সেই প্রথম প্রণব মুখার্জিকে দেখি। একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক। আমার অনেকদিনের সাধ পূরণ হল। প্রথম আলাপেই উনি জানতে চান, কোথায় থাকি। আমার উত্তর শুনে বলেছিলেন, আমিও মুর্শিদাবাদের জামাই। উনি ছিলেন ভারতের রাজনীতিতে আমার দেখা সেরা 'ভদ্র' রাজনীতিবিদ। এরপর আমাদের প্রতিষ্ঠানের দরকারে ওনার সঙ্গে অনেকবার দেখা করেছি। আমাকে বসিয়ে প্রণব মুখার্জি প্রাণ খুলে কথা বলতেন। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্থান ভাগ হয়। তখন লালগোলা, জঙ্গিপুর সব পাকিস্তানের ভেতর চলে যায়। ওই সময় কী কী আন্দোলন হয়েছিল সেই

সব কথা উনি আমাকে বলতেন। সব কথার শেষে একটা কথা প্রায়ই বলতেন, 'মানস সব কিছু ফিরে পাবে, কিন্তু ইজ্জত একবার চলে গেলে আর পাবে না। নিজের আদর্শকে সম্মান দিও। কারোর ক্ষতি করে আনন্দ উপভোগ করো না'।

২০১০ সালের প্রথম দিকে আমাদের সংস্থার তিনদিনের ন্যাশনাল কনফারেন্স ঠিক হয় কলকাতার আইটিসি হোটেলে। তখন আমি আইসিএআই-র ইস্টার্ন ইন্ডিয়া রিজিওনাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। কিছু দুর্বল মানসিকতার লোক আমার বিরুদ্ধে প্রণব মুখার্জির দফতরে অভিযোগ জানিয়ে চিঠি পাঠায়। উনি তখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। ওই দুর্বল মানসিকতার লোকেরা জানত, আমাদের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসাবে আসবেন। বাধ সাধল ওই চিঠি। প্রণব মুখার্জি রাজি হলেন না। ওঁর জায়গায় অন্য একজনের ব্যবস্থা করতে হবে। আমি তখন আরেকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ব্যবস্থা করার জন্য চিন্তাভাবনা করছি। কিন্তু ভরসা না পেয়ে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে যাই। উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। সোমনাথবাবু রাজি হলেন ঠিকই কিন্তু উনি খুব অসুস্থ ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে একজন শিল্পপতি ও রাজ্যের এক ক্রীড়া মন্ত্রীর ব্যবস্থা করে দেন। আমায় বলেন, 'বিপদে ভেঙে পড়লে হারতে হয় আর বিপদে মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করলে জয় হবেই'। সোমনাথবাবু বলেন, 'তোমাদের সদর অফিস কলকাতায় হওয়ায় ক্ষতি হয়ে গেছে। যাঁরা একইসঙ্গে চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট ও কস্ট ম্যানেজমেন্ট তাঁরা মনে প্রাণে চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট। তাঁরা তোমাদের ভালো করবে না'।

আমাদের ওই তিনদিনের কনফারেন্স দারুণ সফল হয়েছিল। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় অসুস্থতার জন্য হাজির হতে না পারলেও ফোন করে সদস্যদের জানান, 'মানসের দোষ নেই। আমার শরীর খারাপ'। সত্যি তিনি যে এত সজ্জন মানুষ আমার জানা ছিল না।

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাবা ছিলেন নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জনসংঘের (তখনও ভারতীয় জনতা পার্টি হয়নি) নেতা। আর সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় নাম লেখান ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে। উনি ১৯৯৬ সালে 'আউটস্ট্যান্ডিং পার্লামেন্টেরিয়ান অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছিলেন। ২০১৩ সালে পান 'ভারত নির্মাণ অ্যাওয়ার্ড'। তিনি ছিলেন লোকসভার ১৪তম অধ্যক্ষ। আজীবন বামফ্রন্টকে নেতৃত্ব দেওয়ার পর পার্টি তাঁকে বহিষ্কার করে। কিন্তু তিনি তাঁর মতাদর্শ থেকে কখনও সরে আসেননি।

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় আজ আর নেই। ওনার সঙ্গে আমার কথোপকথন সারা জীবন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে। সবসময়ে দাম দিই ও দিয়ে যাব। সোমনাথবাবু, আপনি যেখানেই থাকুন, ভালো থাকুন।

কাছের মানুষ কাজের মানুষ সুব্রত মুখার্জি

জননেতা সুব্রত মুখার্জি। এই নামটা এখন শুধুই স্মৃতি। সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তিনি। এই প্রবীণ রাজনীতিকের জীবনে বর্ণময় চারটি অধ্যায়- ছাত্রনেতা, শ্রমিক নেতা, বিধায়ক ও মন্ত্রী। এর সঙ্গে অবশ্যই তাঁর জীবনের আরেকটি স্মরণীয় অধ্যায় ছিল। কলকাতার মহানাগরিকের জীবন। জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের কাজের ক্ষেত্রে সুব্রত মুখার্জি নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেছেন। কলকাতার মেয়র হিসাবেও কিন্তু তিনি ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছেন।

শুধু কাজের ক্ষেত্রে নয়, মানুষ হিসাবেও তিনি ছিলেন খুব রঙিন। হাসি-ঠাট্টা ও মজায় সবাইকে জমিয়ে রাখতেন। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। নিজের দলের সঙ্গে তো বটেই, বিরোধীদের সঙ্গেও সুব্রত মুখার্জির সখ্যতার সম্পর্ক ছিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাতে গোনা যে কয়েকজন 'তুই' বলে সম্বোধন করেন তার মধ্যে সুব্রত মুখার্জি একজন।

রাজনীতির লোক না হলেও কাজের সূত্রে আমার সঙ্গে সুব্রত মুখার্জির অনেকদিনের পরিচয় ছিল। খুব দরকার না হলে আমি ওই সব ব্যস্ত মানুষদের থেকে দূরে থাকতাম। অকারণে বিরক্ত করতাম না। বেশ মনে আছে, ২০০৪ সালের ১৪ আগস্ট আমাদের হরিশ মুখার্জি রোডের অফিসে কলকাতা পুরনিগম থেকে জলের লাইন কেটে দেওয়ার নোটিশ এসেছে। আমি ঠিক এক মাস আগে কাউন্সিল সদস্য হয়েছি। ওই সময় যিনি কাউন্সিলের পূর্ব ভারতের চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি চাকরি

করতেন। তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না এই সমস্যা মেটানো বা সময় দেওয়া। অগত্যা আমার ওপর দায়িত্ব পড়ল। আমি অনেক নেতা ধরে শেষ পর্যন্ত কলকাতার মেয়র সুব্রত মুখার্জির সঙ্গে দেখা করার সময় পেলাম। ওঁর ঘরে ঢোকামাত্র বেশ কিছু অফিসার জোর দিয়ে বলে উঠলেন, 'স্যার, ওনাকে আমরা বলেছি হাসপাতাল, রেস্টুরেন্ট, হোটেল কাউকেই ছাড়ছি না। কিন্তু উনি শুনছেন না'। তখন মেয়র হেসে বলেছিলেন, 'ওনারা কষ্ট করে কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়েছেন সহজে ছেড়ে দেওয়ার জন্য'? আমি একটু হলেও আশার আলো দেখতে পেলাম। উনি সেবার অনেক সাহায্য করেছিলেন। বলেছিলেন, ২৭ বছর ধরে জলের ট্যাক্স জমা দেয়নি। উনারা কী ব্যস্ত না মনে নেই। সুদে ছাড় দিয়েছিলেন। পরে ওনার সঙ্গে আবার দেখা হয় ২০১২ সালে। ওই সময়ে আমরা পঞ্চায়েতের ওপর ক্যাজা-র সঙ্গে একটা রিপোর্ট করি। আমার ওই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল 'অ্যানালিসিস অ্যান্ড বেঞ্চমার্কিং অফ পিআরআই পারফরম্যান্স'। সুব্রত মুখার্জি ডেকে বলেছিলেন, 'আমাকে ছোটো করে একটু বুঝিয়ে বলুন এই রিপোর্টে আমাদের কী উপকার হবে'? আমি বুঝিয়ে বলার পর উনি দু'বার ভাবেননি। আমাদের দিয়ে সারা বাংলা পঞ্চায়েত অ্যাকাউন্টিং টেকনিক বিষয়ে একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম করিয়েছিলেন। ওঁর খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল। কোন কাজটা কখন করাতে হবে সেটা খুব ভালো বুঝতেন। এরপরও বেশ কয়েকবার আমাকে ডেকেছিলেন অ্যাকাউন্টিং বিষয়ে আলোচনার জন্য। সুব্রত মুখার্জি আমাকে বারবার বলতেন, 'আপনারা পিছিয়ে রয়েছেন বুদ্ধিতে নয়, সামগ্রিক পারফরম্যান্সে। আপনাদের মধ্যে যাঁরা ডুয়েল কোয়ালিফায়েড তাঁদের উঠতে দেবেন না। এতে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়'। ওনাকে আমি ধন্যবাদ না দিয়ে পারব না। কারণ পঞ্চায়েতের স্বনির্ভরতা-এই বিষয়ে ওনাকে একটা ধারণা দেওয়ায় উনি আমাকে সমর্থন করেন। স্বীকার করে নেন, এই ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের পরিকাঠামো ও সদিচ্ছার খুব অভাব রয়েছে। আমি যখন ২০২০ সালে ওয়েবরেডা'র কার্যকরী বোর্ডের সদস্য হলাম ওই সময় কিছু প্রশ্ন করতেই উনি বলেছিলেন, 'আমাদের গভর্নিং বডিতে এই প্রথম অ্যাকাউন্টসের লোক চলে এসেছে। আপনি একটু দেখে নেবেন প্লিজ'। উনি তখন একজন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। পদাধিকার বলে ওয়েবরেডার চেয়ারম্যান হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কথা শুনতেন আর ভালো কাজের উৎসাহও দিতেন। আমার সঙ্গে যখন বসে কথা হত, তখন বলতেন, 'প্রোজেক্টের বাজেট আর খরচের পার্থক্যটা দেখুন। খরচ হবে কিন্তু খরচের পরিমাপ বা সুবিধা পাওয়া যাবে কি! আপনাদের পরামর্শ খুব জরুরি'। গতবছরের শেষের দিকে একবার দেখা হতেই মন্ত্রী বলেছিলেন, অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট বিষয়টি যদি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে আনা যেত তাহলে প্রশাসনের খুব সুবিধা হত। সুব্রত মুখার্জি আমাকে প্রায়ই বলতেন, রাজ্যের মন্ত্রালয়ে আপনাদের মতো একজন করে লোক দরকার। যাঁরা খরচ কমাতে সাহায্য করবে একইসঙ্গে প্রশাসনকেও শক্তিশালী করবে। আমার কাছে সুব্রত মুখার্জি ছিলেন সত্যি একজন কাছের মানুষ, কাজের মানুষ। প্রণাম সুব্রতদা, আপনি যেখানেই থাকুন, ভালো থাকুন।

অনন্য দূরদৃষ্টির শোভন দেব

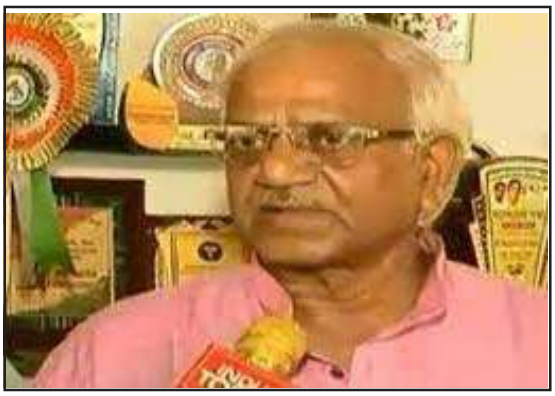

২০১৪ সাল। ওই সময় আমি দ্য ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট অফ ইন্ডিয়ার কাউন্সিল মেম্বার ও রিসার্চ অ্যান্ড জার্নাল কমিটি'র চেয়ারম্যান। আমাদের আঞ্চলিক কেন্দ্রের এক সম্মেলনের অনুষ্ঠান উদ্বোধনে রাজ্যের একজন মন্ত্রীকে নিয়ে আসার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হল। মাত্র ২ দিনের মধ্যে সব ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক চেষ্টা করে একজনের কাছে পৌঁছলাম। তখন হাতে আর মাত্র ১ দিন সময়। অনুরোধ করার পর বিভাগীয় মন্ত্রী জানান, মিস্টার ঠাকুর, আমি আপনাদের সংস্থাকে খুব সম্মান করি, অন্যভাবে দেখি। কিন্তু আমি অসহায়। ওই সময় আমার একটা মিটিং ঠিক করা রয়েছে। পরের বার একটু আগে বলবেন, নিশ্চয় যাব।' আমি ব্যর্থ হলাম কিন্তু আশা ছাড়িনি। পরের এক অনুষ্ঠানে ওনাকে পেলাম। উনি মঞ্চে এসে যা বললেন, তাতে আমি স্তম্ভিত হলাম। উনি বললেন, ২টো প্রফেশন যে কোনও ব্যবসাকে বাঁচাতে পারে। আবার মারতে পারে। কর্মীদের ক্ষতি না করে সংস্থাকে দীর্ঘমেয়াদী করতে পারে ও মুনাফা বাড়াতে পারে। এই দুই প্রফেশন হল, কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট

ও ইঞ্জিনিয়ারিং। ওই অনুষ্ঠানে ৪০০'র বেশি লোক এসেছিলেন। তাঁরা সবাই হাততালি দিয়ে স্বাগত জানান। আর ওই বক্তা ছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ওই সময় তিনি ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী। এরপর আমাদের অনেক অনুষ্ঠানে উনি এসেছেন। ওনার সঙ্গে ধীরে ধীরে আমার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি হয়। একটা সময়ের পর সবাই বলত, আমি অনুরোধ করলেই উনি আসবেন। হয়েছেও তাই। আমার অনুরোধে ব্যস্ততার মধ্যেও উনি অনুষ্ঠানে এসেছেন, বলেছেন একটু হয়তো দেরি হবে যেতে।

আমি এমন ভদ্র ও কস্টিং সম্পর্কে জ্ঞান থাকা মন্ত্রী খুব কম দেখেছি। উনি আমার সঙ্গে অনেকবার আলোচনা করেছেন কীভাবে খরচ কমানো যায় বা কস্ট এফিসিয়েন্সি করা যায়। ওনার কথায় বার বার উঠে এসেছে 'কস্ট ম্যানেজমেন্ট'র প্রয়োগ যদি ঠিকঠাক হয় তাহলে বিদ্যুৎ পরিষেবা ও তার খরচ গ্রাহকের সাহায্য করবে। ভারতের মতো দেশে কৃষি ও ক্ষুদ্র-ছোটো-মাঝারি শিল্প মন্ত্রকে কস্ট ম্যানেজমেন্টের প্রয়োগ খুব দরকার। ওনার মতে, সরকারি দফতর বা মন্ত্রিসভার উপদেষ্টামণ্ডলীতে বা 'স্বাধীন ডিরেক্টর' হিসাবে কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট থাকলে অনেক সুবিধা হতে পারে। একবার শোভনদেব আমাকে আলোচনায় ডাকেন। বলেন, মিস্টার ঠাকুর, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ, পরিবেশন ইত্যাদি পর্যায়ে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ নষ্ট হয় তা কমাতে পারলে আমরা বিদ্যুতের দাম কমাতে পারি। তিনি আরও একটা প্রশ্ন তোলেন, সৌরশক্তির উৎপাদন খরচ এত বেশি হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা সৌরশক্তিকে বিকল্প কীভাবে ভাবব? জবাবে বলেছিলাম, সৌর প্যানেল বোর্ড যত তৈরি হচ্ছে তার খরচ যত কমবে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন তত কমবে। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তখন বলেন, এটার সামাজিক উদ্দেশ্য যেন ব্যর্থ না হয়। সৌর বিদ্যুৎকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। এই চেতনা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমাকে উনি বারবার বলতেন, শিল্পের উন্নতি দরকার, পাশাপাশি দরকার কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়ানো ও সবার মধ্যে শিল্পোদ্যোগ ভাবনাচিন্তা আনা। উদ্যোমী মনোভাবের মাধ্যমে আমরা তরুণ প্রজন্মকে মানসিক দৃঢ়তা ফিরিয়ে দিতে পারব। এর জন্য সঠিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে, যাতে তাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এখন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী। আমি জানি উনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কস্ট ম্যানেজমেন্টের ব্যবহারিক প্রয়োগ আনবেন। কারণ ওনার দূরদর্শিতা অনেক বেশি। কাজের ক্ষেত্রে খুব দক্ষ।

জীবনে কখনো এমন ব্যক্তিত্বের মানুষ দেখিনি

২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ। তখন আমি দ্য ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্টস অফ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সভাপতি।পন্ডিচেরির মুখ্যমন্ত্রী এন নারায়ণ স্বামী এক বৈঠকে আমাকে আমন্ত্রণ জানান। ক্ষুদ্র শিল্প ও দক্ষতা উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা ছিল। পন্ডিচেরি পৌঁছোনার পর হঠাৎই সেখানের রাজ্যপালের কথা আমার খেয়াল হয়। ওই সময় পন্ডিচেরির রাজ্যপাল ছিলেন দেশের প্রথম প্রাক্তন মহিলা আইপিএস অফিসার কিরণ বেদি। আচমকা এভাবে একজন হাই প্রোফাইল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ চাওয়াটা আমার নিজেরই মনে হয়েছিল অন্যায়। কিন্তু আমার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের চেষ্টায় খুব অল্প সময়ের জন্য সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়। প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা আমার বেশ মনে আছে। কিরণ বেদি বলেছিলেন, 'ভারতের মতো দেশে প্রকৃত কস্টিং সিস্টেম খুব দরকার। এই ব্যাপারে আপনাদের আরো বেশি আক্রমণাত্মক হতে হবে'। উনি প্রশ্ন করেছিলেন, কস্ট অডিট কোন কোন ক্ষেত্রে হয়? আমার উত্তর শোনার পর তিনি বলেন, সব তালিকাভুক্ত কোম্পানি, স্বাস্থ্য দফতর, শিক্ষা দফতর ও খাদ্য দফতর অবশ্যই কস্ট অডিটের আওতায় আসা উচিত। ওনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর আমার মনে হয়েছিল পেশাদারিত্ব ও পেশা এই দুটো বিষয়ই উনি খুব ভালো বোঝেন। এরপর কিরণ বেদির সঙ্গে অনেকবারই দেখা হয়েছিল। কখনো বিমানবন্দরে, কখনো এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে, আবার কখনো বিমানের মধ্যেই। একটা ঘটনা মনে পড়ছে যেটা না বললেই নয়। একবার আমি বিমানের বিজনেস ক্লাসের আসনে বসে রয়েছি। আচমকা মুখ তুলে দেখি দেহরক্ষী নিয়ে কিরণ বেদি আমাকে পেরিয়ে গিয়ে একজিটিউটিভ ক্লাসের আসনে গিয়ে বসলেন। আমি দেখে সত্যিই বিস্মিত হলাম। আসন থেকে উঠে ওনার কাছে গিয়ে

জানতে চাইলাম, 'আপনি এখানে কেন'? উনি হেসে উত্তর দিলেন, 'যেখানেই বসি আপনার আগে নামব ও একই সময়ে দিল্লি পৌঁছোব'। আমার জীবনে আগে কোনোদিন এই রকম বিশেষ ব্যক্তিত্বের মানুষ দেখিনি। যিনি অসম্ভব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়েও বিমানের সাধারণ শ্রেণিতে যাতায়াত করা পছন্দ করেন। এটা সত্যিই আমার জীবনের এক বড়ো শিক্ষা। এরপর আর একবার সাক্ষাৎকারে কিরণ বেদি আমাকে বলেছিলেন, 'আর্থিক স্বনির্ভরতা না থাকলে প্রকৃত ক্ষমতায়ন আসবে না। উপার্জন ও সঞ্চয়ই একজনকে স্বনির্ভর করতে পারে'।

দেশের প্রথম প্রাক্তন মহিলা আইপিএস অফিসার কিরণ বেদি তাঁর কাজের জন্য ২০০৩ সালে 'ইউনাইটেড নেশন' মেডেল পান। প্রথম ভারতীয় ও মহিলা আইপিএস হিসাবে ইউনাইটেড নেশন সিভিল পুলিশ অ্যাডভাইজার পদ পান। 'রামন ম্যাগসেসে' পুরস্কারও তাঁর জীবনের বড়ো প্রাপ্তি। দেশের কারাগার সংস্কারের বিষয়টি তাঁরই মস্তিস্কপ্রসূত। এমন অনন্য ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে আমাদের অনেক সামাজিক শিক্ষা নেওয়া রয়েছে।

বর্ণময় মানুষ ছিলেন অরুণ জেটলি

২০১৫ সালের ২১ জুলাই। আমি দি ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্টস অফ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি নির্বাচিত হলাম। প্রোটোকল অনুসারে পরের দিন আমাদের দেখা করতে হয় অর্থ মন্ত্রক ও কর্পোরেট মন্ত্রকের বিভাগীয় মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে। সবার সঙ্গে দেখা হলেও বিভাগীয় মন্ত্রী অরুণ জেটলির সঙ্গে দেখা হল না। অধীর অপেক্ষায় ছিলাম। দেশের অর্থমন্ত্রী বলে কথা। শেষ পর্যন্ত ১ আগস্ট দেখা হল অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু সেভাবে আলোচনার সুযোগ হল না। তবে প্রথম দেখাতে মুগ্ধ হলাম ওঁর ব্যক্তিত্বে। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। কথা কম বলেন। ভালো শ্রোতা। সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি ছিলাম বলে আরো ২ বার আমাদের দেখা হয় কিন্তু আলোচনার সুযোগ হয়নি। অপেক্ষায় ছিলাম। কবে ওঁকে বোঝাতে পারব কেন ভারতে কস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টদের দরকার। পরের বছর আমি দি ইনস্টিটিউট অফ কস্ট ম্যানেজমেন্ট-র সভাপতি নির্বাচিত হলাম। আর এই সভাপতি হওয়ার জন্য বার বার তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির সঙ্গে দেখা হয়। ধীরে ধীরে আমি ওঁর ফ্যান হয়ে উঠি। আমি বার বার ওঁকে বোঝাতে চাইতাম আমাদের দেশে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কতটা। আর কেন জানি না উনি অন্যদের তুলনায় আমাকে একটু বেশি 'স্পেস' দিতেন।

২০১৬ সালে আমাদের সংস্থার জাতীয় সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ছিলেন আমাদের প্রধান অতিথি আর আমি ছিলাম চেয়ারম্যান। ওই সম্মেলনে তাঁর ভাবনা আমাকে মুগ্ধ করেন। সেদিন দেখেছিলাম ওঁর দূরদর্শিতা। উনি সবসময়ে সময়ের থেকে এগিয়ে ভাবতেন। চটজলদি সিদ্ধান্ত নিতেন। একান্ত আলোচনায় অরুণ জেটলি আমাকে বলেন, ভারতের জনসংখ্যা একটা সমস্যা কিন্তু সমস্যাটাকে সুযোগ ও সম্ভাবনায় পরিণত করা যায়। কিন্তু একটা শ্রেণি খুব স্বার্থপর। লোভী হয়ে গেছে। দূরদর্শিতার জন্য অরুণ জেটলি ভারতের মতো দেশে জিএসটি, আইবিএল, এনে একটা আর্থিক বদল আনতে পেরেছেন।

অরুণ জেটলি দেখা হলেই আমাকে বলতেন, তোমার কথাই ঠিক। দেশের আর্থিক বৃদ্ধির জন্য ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট পেশাদারদের খুব দরকার। কিন্তু আমাদের নেতাদের লক্ষ স্থির নেই। তোমরাই ভারতের অর্থনীতির কাণ্ড হতে পারো। যদি সঠিক পরিকল্পনা থাকে।

আমার কাছে অরুণ জেটলি ছিলেন 'গ্রেট লিডার'। যথার্থ নেতা।

বিজনেস লিডার সুব্রহ্মনিয়ন রামো ডোরি

এই পর্বে আমি এমন একজনের কথা লিখছি তিনি কোনো রাজনৈতিক নেতা বা ধর্মীয় গুরু নন, অথচ আমার জীবনে দেখা 'বিজনেস লিডার'-র মধ্যে তিনি অন্যতম। সময়টা ২০১৫ সালের শেষের দিকে, তখন আমি ইনস্টিটিউট অফ কস্ট

অ্যাকাউন্টস-র ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমার মাথায় ঘুরছিল বাংলার এত ছেলে-মেয়ে বেকার। কিভাবে তার সমাধান সূত্র বের করা যায়। রাজ্যস্তরের অনেক নেতার সঙ্গে আলোচনা করে কোনো সুফল না পেয়ে শেষে মনে করলাম একবার শেষ চেষ্টা করি। একবার মুম্বই যাই ও শেষ পর্যন্ত আমার কাঙ্ক্ষিত মানুষের কাছে পৌঁছোই। সেখানে আমার প্রস্তাব ছিল কলেজ স্তরে ৩-৪ মাসের স্কিল ডেভেলপমেন্ট ও অ্যান্তারপ্রেনিউরশিপ-র প্রশিক্ষণ চালু করার। যার খরচ বহন করবে সংশ্লিষ্ট কোম্পনাই তার সিএস আর ফান্ড থেকে। আমাদের প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব থাকবে সনাজের প্রতি পেশাদার দায়িত্বপালন। একটা কলেজে একটা ব্যাচে খুব বেশি হলে ৭০০০০-৮০০০০ টাকা খরচ পড়বে। জহরী জহর চেনে ঠিক সেই রকম ৩০ মিনিটের আলোচনার পরে তিনি আমার কথা বুঝে গেলেন ও রাজিও হলেন। আলোচনায় আমি দেখলাম উনি একটা বাজে শব্দও খরচ করেননি। আমি আনন্দে আত্মহারা হলাম, এমন লোকের সঙ্গে কথা বলতে পেরে। বেশ গর্বও হচ্ছিল। ফিরে এসে আমাদের অফিস ও সংশ্লিষ্ট কলেজকে বোঝাতে গিয়ে আমার ঘাম ছুটে যায়। আমার কাছে, সবার প্রশ্ন ছিল আমাদের কী থাকবে? আমি বোঝাতে পারছিলাম না ওই সব বেকার ছেলে-মেয়েরা আমাদের সমাজের অঙ্গ। ওদের উন্নতি মানে সমাজের উন্নতি। ওদের প্রতি আমাদের দায়-দায়িত্ব রয়েছে। অনেক চেষ্টার পর ১৫টা কলেজ রাজি হয়। ঠিক আমরা ইনস্টিটিউট-র কনফারেন্স হলে একটা অনুষ্ঠান করে বিষয়টা প্রচার করবো। আমাদের ইনস্টিটিউট দেখলাম বেশি খরচ করতে রাজি নয়। তখন আমি বাধ্য হয়ে ওই বিজনেস লিডার-র পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টকে ফোন করলাম পুরো বিষয় জানিয়ে। আরো জানালাম তাঁর বিজনেস ক্লাসের খরচ দিতে গেলে আমাদের প্রতিষ্ঠান সমস্যায় পড়বে। উনি সব শুনে বলেন,'আমি যাবো'। উনি ওই দিন এসেছিলেন উদ্বোধন করতে এসেছিলেন কলকাতায়। (৫ ঘন্টার জন্য)। নিজের খরচে। ওই দিনের অনুষ্ঠানে প্রায় আড়াইশো লোক হলে হাজির ছিলেন। ৪০টা কলেজের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। ওই সভায় উনি খুব শান্তবাবে বলেন, আমি এসেছি কারোর উপকার করতে নয়। আমার নিজের জন্য। এটা আমার মানসিক শান্তি। এই যে প্রোজেক্টটা মানস ঠাকুর চেষ্টা করছেন, সফল হলে বাংলা হবে এমএসএম-ইর নতুন রূপদাতা। যা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বে।

এই প্রোজেক্টই বেকার সমস্যার সুরাহার উপায়।

যদিও আমি সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে ওই প্রোজেক্টটা সফল করতে পারিনি। পরে ওনার কাছে গিয়ে আমার অসাফল্যের কারণ জানাই। সেদিন উনি যা বলেছিলেন তা আজও মনে রেখেছি। সেদিন উনি বলেছিলেন- প্রথমত, জীবন একটা চ্যালেঞ্জ কিন্তু হারতে শিখতে হবে। হারার মধ্যে আনন্দ খুঁজতে হবে। দ্বিতীয়ত, অসম্ভব বলে কিছু হয় না। সময় ও অধ্যাবসায় ওপর ভিত্তি করে জীবনের পরিকল্পনা করতে হয়। তৃতীয়ত, শুধু কিছু শিক্ষিত লোকজনের কথা ভাবলে হবে না। ভাবনাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। সবাইকে স্বপ্ন দেখাতে হবে। যেমন জাপান দেখায়। চতুর্থত, লোকের সঙ্গে সহযোগিতার মধ্যে এক আনন্দ লুকিয়ে রয়েছে। এটা জানতে হবে। এবার বলি, ওই মানুষটার নাম-সুব্রহ্মানিয়ন রামো ডোরাই। টিসিএস কে টিসিএস বানিয়েছেন উনি। স্বপ্ন আর সংগ্রামের আর এক নাম সুব্রহ্মনিয়ন। দেশের নামি দামি কর্পোরেট সংস্থার চেয়ারম্যান, অ্যাডভাইসার। দেশে- বিদেশে পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার। যেমন, পদ্মভূষণ, এশিয়া বিজনেস লিডার অফ দি ইয়ার ইত্যাদি। বিশাল মানষটার আত্মবিশ্বাস রয়েছে কিন্তু নেই অহংকার। আমি ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। জেনেছি মানুষ ও মনুষ্যত্বের পার্থক্য।

প্রশাসনের গুরুদায়িত্ব সামলেও সৃষ্টির নেশায় মগ্ন

রাজ্য প্রশাসনের নানা দায়িত্বশীল পদে রয়েছেন তাঁরা। সারাদিন ধরে হাজারো চাপ সামলেও নিজেদের মতো করে সময় বের করে নানা সৃজনশীল কাজ করে চলেছেন প্রশাসনের সেই সব আধিকারিকরা। তেমনই কয়েকজন আধিকারিকের কথা জানাচ্ছেন সবুজ সেন।

নাটককার আবগারি আধিকারিক সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়

মেদিনীপুরের কন্টাই সার্কেলের রাজ্য সরকারের আবগারি আধিকারিক সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়। ২৯ বছর ধরে চাকরি করছেন। আর তার মধ্যেই সময় বের করে লিখে চলেছেন নাটক। তাঁর নাটকের জীবনও প্রায় তিন দশকের। ২০২২ সালে নাট্য আকাদেমি থেকে স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক 'অচেনা অন্ধকার'এর জন্য স্বল্প দৈর্ঘ্যের সেরা নাট্যকার হিসাবে পুরস্কার পান। তাঁর লেখা একাঙ্ক নাটকের সংখ্যা ৯৬টি, পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা ৩৬টি ও অন্তরঙ্গ নাটকের সংখ্যা ৪টি। এছাড়াও রয়েছে ৫টি বেতার নাটক ও ১০টি শ্রুতিনাটক। এই মুহূর্তে তাঁর লেখা অন্তত ১৪-১৫টি নাটক বিভিন্ন দল মঞ্চস্থ করছে। রোজকার প্রশাসনিক কাজ সামলে সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বাড়ি ফিরে নিয়ম করে রাত ৯টা-১২টা পর্যন্ত নাটক লেখেন। তাঁর কথায়, 'এই সময়টা একান্ত আমার। তখন নিজের সরকারি পরিচয় ভুলে হয়ে যাই নাটককার। চেনা-অচেনা সব চরিত্র আমার লেখায় ভিড় করে। ধীরে ধীরে তাদের পূর্ণাঙ্গ রূপ দিই।' আবগারি দফতরের কাজ নাটক লেখার কাজে প্রভাবিত করে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে নাটককার সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, 'অবশ্যই করে। বিভিন্ন জায়গায় রেইড করতে গিয়ে নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়। ওই সব লোকজনের জীবন ও কাহিনি আমার নাটকে উঠে আসে। আমি সবসময় বাস্তবধর্মী কাহিনি লিখতে পছন্দ করি।' তাঁর আরো বক্তব্য, সরকারি পদে থাকায় অনেক কিছু আবার লেখা যায় না। শখ হিসাবে নাটক কেন বেছে নেন, এর উত্তরে আবগারি আধিকারিক সঞ্জয় বলেন, 'কবিতা, গল্প কিংবা উপন্যাস লেখার চেয়ে নাটক লেখায় আমি বেশি স্বচ্ছন্দ। নাটকের মাধ্যমে নিজের কথা তুলে ধরতে পারি। একমাত্র এই মাধ্যমে সরাসরি দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ হয় বলে তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানা যায়। এটাই আমার কাছে অনেক বেশি স্যাটিসফেকশন'।

রাজস্ব দফতরের জয়েন্ট কমিশনার আলোকচিত্রী অনুপম হালদার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্ব দফতরের জয়েন্ট কমিশনার অনুপম হালদার। ভবানীভবনে তাঁর দফতর। রাজস্ব দফতরের আধিকারিকের দায়িত্ব সামলানোর সঙ্গে সঙ্গে ছবি তোলা তাঁর নেশা। সৃজনশীল আলোকচিত্রী হিসাবে রাজ্য সরকারের চারুকলা উৎসব, ক্যালকাটা জার্নালিস্টস ক্লাব, মনিকর্ণিকা আর্ট গ্যালারি সহ নানা সংস্থা থেকে পুরস্কারও পেয়েছেন।

শুভাপ্রসন্ন'র আর্টস একরের আর্ট মিউজিয়ামে ঠাঁই পেয়েছে তাঁর দুটো ক্রিয়েটিভ ফটোগ্রাফি।

স্কুল জীবনে পড়ার সময় থেকেই অনুপমের আর্ট ও ফটোগ্রাফির প্রতি টান জন্মায়। পরে চাকরি জীবনে সেই আকর্ষণ আরও বাড়ে। চাকরির শুরুতে একজন রাজস্ব আধিকারিক হিসাবে জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে একা থাকার সময় তাঁর সঙ্গী ছিল বাবার দেওয়া ক্যামেরা। কাজের ফাঁকে যেখানেই যেতেন ছবি তুলে ক্যামেরায় বন্দি করতেন। সহকর্মীরাও তাতে উৎসাহ দিতেন। ডিজিটাল সিনেমাটোগ্রাফির ওপর কোর্স করেন। এরপর তাঁর তোলা ফটো কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ওই সব ছবি নিয়ে ২ বছর আগে অনুপম হালদার কলকাতার আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে ক্রিয়েটিভ ফটোগ্রাফির সোলো এগজিবিশন করেন। এরপর থেকে কলকাতার প্রথম সারির সব সংবাদপত্রে তাঁর আলোকচিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। এরপর ফটোগ্রাফিতে ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠা অনুপম একের পর এক প্রদর্শনী বিড়লা আকাদেমি অফ আর্ট গ্যালারি, আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস গ্যালারি, আলতামিরা আর্ট গ্যালারি, মানিকতলা আর্ট গ্যালারিতে অংশ নেন। একবার বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবসে তাঁর ফটোগ্রাফি জায়গা পায় ন্যাশনাল আকাদেমি অফ ফটোগ্রাফি সংস্থার প্রদর্শনীতে। এই সরকারি আধিকারিকের ছবি এবার মনোনীত হয়েছে নয়াদিল্লির ললিতকলা আকাদেমির ৬৩তম জাতীয় শিল্পকলা প্রদর্শনীতে। অনুপমের তোলা বিভিন্ন ধরনের সৃজনশীল আলোকচিত্র নিয়ে আকাদেমিতে প্রদর্শনী হয় ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত। সেখানে ছবির প্রদর্শনীর পাশাপাশি ছিল আলোকচিত্র নিয়ে নানান আলোচনা।

আলোকচিত্রী অনুপমের কথায়, 'করোনা অতিমারির সময় ফটোগ্রাফি আমাদের জীবনে নতুন দিশা দেখায়। ওই দুঃসময়ে রকমারি আলোকচিত্র ছিল নিঃসঙ্গ মানুষের সঙ্গী। ঠিক ওই সময়ে বোঝা যায় মানুষের জীবনে ফটোগ্রাফির গুরুত্ব কতটা।' এই রাজ্যে গণমাধ্যমে ফটো জার্নালিজমের পাশাপাশি ক্রিয়েটিভ ফটোগ্রাফির গুরুত্বও কি বাড়ছে? এর উত্তরে আলোকচিত্রী অনুপম জানান, 'বিদেশে ফাইন আর্টসের পাশাপাশি ক্রিয়েটিভ ফটোগ্রাফিকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেখানে এই ধরনের আলোকচিত্রের জন্য নানা পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকে। যার আর্থিক মূল্যও অনেক। তবে গত ২-৩ বছর ধরে কলকাতাতেও ক্রিয়েটিভ ফটোগ্রাফির কদর বাড়ছে। বিভিন্ন আর্ট গ্যালারিতে চিত্রকলা-ভাস্কর্যের সঙ্গে সঙ্গে সৃজনশীল আলোকচিত্র রাখা হচ্ছে। রাজ্য সরকারও চারুকলা উৎসবে ফাইন আর্টসের পাশাপাশি ক্রিয়েটিভ ফটোগ্রাফি রাখছে। এই বছরের উৎসবে অন্তত ১৩টি আলোকচিত্র ছিল। এটা কম কথা নয়। দরকার আরো বেশি প্রচারের। তবে আশার কথা, নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ক্রিয়েটিভ ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে। অনেকের কাজ বেশ উঁচু দরের। ডিজিটাল প্রযুক্তি আসায় অলোকচিত্রে এক যুগান্তকারী বিপ্লব এসেছে। এই প্রযুক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে।' কথায় কথায় অনুপম জানান, তাঁর বেশি পছন্দ ল্যান্ডস্কেপ ফোটোগ্রাফি। অফিসে বা যেকোনো জায়গায় যাওয়ার সময় ক্যামেরা সঙ্গে রাখেন। পছন্দমতো ফ্রেম পেলেই সঙ্গে সঙ্গেই 'ক্লিক'। তাঁর কথায়, 'ছবি তোলার ক্ষেত্রে যেমন সহকর্মীদের উৎসাহ পাই, তেমনি প্রেরণা পাই বাবা-মা ও স্ত্রীর থেকেও।' অনুপম হালদারের স্ত্রী পাঞ্চালি মুন্সিও রাজ্য সরকারের আধিকারিক। অনুপমের প্রতিটা প্রদর্শনী ও কাজে তিনিও সঙ্গে থেকে সাহস আর উৎসাহ জুগিয়ে চলেন।

লোকসংস্কৃতির খোঁজে আইপিএস সুখেন্দু হীরা

রাজ্য নিরাপত্তা আধিকারিক আইপিএস সুখেন্দু হীরা। পুলিশ-প্রশাসনের গুরুদায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি অনেকদিন ধরেই লোকসংস্কৃতি নিয়ে কাজ করে চলেছেন। এই পুলিশ আধিকারিক ক্ষেত্র সমীক্ষা করে ডকুমেন্টেশনের কাজ করে থাকেন। বাংলার পটচিত্র, গাজন, পুরোনো রথের মেলা নিয়ে কাজ করার পর এখন ব্যস্ত রয়েছেন আন্দুলের কালী কীর্তন নিয়ে। শ্যামাসঙ্গীতের এক বিশেষ রূপ এই কালীকীর্তন, যা এক সময়ে গ্রাম বাংলায় খুবই জনপ্রিয় ছিল।

সুখেন্দু হীরার স্কুল ও কলেজ জীবন থেকেই লোকসংস্কৃতি নিয়ে আগ্রহ ছিল। চাকরি জীবনে সেই টান আরো বাড়ে। তাঁর কথায়, 'প্রশাসনিক কাজের সূত্রে খুব সহজে নানা জায়গায় যেতে পারি। সেখানে গিয়ে লোকশিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে নানা তথ্য জোগাড় করি।' তিনি চাকরির সূত্রে নানা জেলায় ঘুরে বেড়ান। তখন শুধু একজন পুলিশ আধিকারিকের চোখ দিয়ে নয়, এক জনসচেতন নাগরিক তথা লোকসংস্কৃতিপ্রেমী

হিসাবে ওই জায়গার শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভূগোল, পর্যটন, অর্থনীতি সব কিছু খুঁটিয়ে দেখেন। এই লোকসংস্কৃতি নিয়ে তাঁর লেখালেখির একটা ছোট্ট কাহিনি রয়েছে। ২০১৯ সাল নাগাদ বন্ধুরা মিলে বিহারের শোনপুর মেলায় বেড়াতে যান। এই মেলা পশুমেলা নামে পরিচিত। শোনা যায়, এক সময়ে এই মেলায় হাতি পর্যন্ত বিক্রি হত। মেলা থেকে ঘুরে এসে কলকাতার এক সংবাদপত্রে তিনি ওই ভ্রমণকাহিনি লেখেন। তাঁর লেখা খুবই প্রশংসিত হয়। এরপর ওই সংবাদপত্রের বিভাগীয় সম্পাদকের অনুরোধে শুরু হয় লোকসংস্কৃতি নিয়ে তাঁর সাপ্তাহিক কলম। যা এখন খুব জনপ্রিয়। শুধু লোকসংস্কৃতি নয়, তাঁর পুলিশ জীবনের কাজের নানা অভিজ্ঞতার কথাও এক জনপ্রিয় দৈনিকের সাপ্তাহিক পত্রিকায় বেরোয়। সদ্য তাঁর লেখা বই 'তদন্তনামা'ও প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে রয়েছে পুলিশ জীবনের ২৪টি কেস স্টাডি। তিনি এই বই উৎসর্গ করেছেন হাওড়ার সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়কে। হাওড়া পুরনিগমের অস্থায়ী কর্মী সুমন্ত'র অনুরোধেই পুলিশ জীবনের কথা লেখা শুরু করেন আইপিএস সুখেন্দু হীরা। সুমন্ত চট্টোপাধ্যায় ২০২২ সালের ৫ মে মাত্র ৪৬ বছর বয়সে মারা যান। এই বইয়ের মুখবন্ধ লিখেছেন প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক সৌমেন মিত্র ও প্রচ্ছদ এঁকেছেন স্বর্ণাভ বেরা। দীপ প্রকাশন থেকে 'তদন্তনামা' প্রকাশিত হয়। এই বই শুধু এক কাহিনি নয়, অনেকটা মাটি থেকে গাছের রস সঞ্চয়ের মতো অভিজ্ঞতার আত্মকথা। নিজের কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে আগামী দিনে আরও কিছু লেখার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন সিনিয়র এই আইপিএস অফিসার।

তাঁর এই লোকসংস্কৃতির কাজ নিয়ে সুখেন্দু হীরা বলেন, 'বাংলার লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য অনেক পুরোনো, যা হারিয়ে যাচ্ছে। তাই এই সব বিষয়ের নথিভুক্তিকরণ খুব জরুরি। সেই কাজটা করে চলেছি। যা লোকসংস্কৃতির গবেষকদের কাছে এক দলিল হয়ে থাকবে।' লোকসংস্কৃতি নিয়ে কাজ করার জন্য গত বছর তাঁকে কুমুদ সাহিত্যমেলা কমিটির পক্ষ থেকে 'লোচনদাস রত্ন' পুরস্কার দেওয়া হয়।

লোকসংস্কৃতি ও অন্যান্য লেখালেখির পাশাপাশি সুখেন্দু হীরার আরেকটি পরিচয় হল গ্রন্থাগারপ্রেমী। কোনো গরিব ছাত্র পড়ার খরচ পাচ্ছে না, আবার কোনো প্রত্যন্ত গ্রামের লাইব্রেরিতে বই নেই। এসব ক্ষেত্রে তিনি এগিয়ে আসেন। চাকরির সূত্রে নানা জেলায় গিয়ে নিজের উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন লাইব্রেরি। অনেকসময় পুরোনো লাইব্রেরির সংস্কারও করেছেন। সিনিয়র আইপিএস সুখেন্দু হীরার কথায়, 'লাইব্রেরি হল মিনি মিউজিয়াম, যা রক্ষা করা দরকার। ছেলেমেয়েদের পড়ার অভ্যাস ফিরিয়ে আনতে লাইব্রেরির কোনো বিকল্প নেই।'

National Research and Development organisation

(IV-1506-0005812022)
মন খারাপের দিনে আর একা নয়, সাথে আছে সাথী
(সাথী স্বাস্থ্য অ্যাপ)

বাংলা নিজস্ব দোকান
(অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মেয়েদের হাতের তৈরি সামগ্রী)

বাংলার পর্ব বলে বাংলার মনের কথা
24×7 Online News Portal

কবিতা—

জল দাও

রমণীকান্ত পাত্র

বাবুমশাইরা, একটু জল দাও
জল, জল, জল---।
জল দাও আমার শরীরে, আমার পাদমূলে।
শুখা মাটি থেকে ভুখা শরীরে
সুধারস আর আসে না।
এই দাবদাহে স্বপ্নরা ঝিমিয়ে-
শাখাভরা অভিমানী সোনালি সবুজ পল্লবে।
ওরা জাগুক, তোমাদের অকৃপণ জল সিঞ্চনে।
বাবুমশাইরা, একটু জল দাও
জল, জল, জল ---।
সেদিনের উৎসবে ঘটা করে
বুকে হাত রেখে পুঁতে ছিলে ভূমে।
জল দিলে, মাটি দিলে ---
আদর মাখা পরশে জমে ছিল আশ-
মৃদু বাতাসে একরাশ কিশলয় বলেছিল-
'হে বন্ধু ! পাশে থেকো বারোমাস।'

উদার আকাশে, মুক্ত বাতাসে, সুহৃদ রোদ্দুরে
বেড়ে ওঠা স্বপ্ন ছিল মনে।
চৌরাস্তার ধারে, বাঁধানো মেরাপে, সাজানো ডায়াসে
বাবুমশাই, তুমি দিয়েছিলে শ্লোগান -
'রোপন কর একদিন
পরিচর্যা কর দিনদিন।'
ছিল করতালি, গৌরবে উছলি সদা
কেউ বলেছিল—'আহা ! যা বলেছেন দাদা।'

দিন যায়, সপ্তাহ, পক্ষও
পথের ধারে অযত্নে একা আজও।
দাবদাহে এই বুঝি যায় প্রাণ।
বাবুমশাইরা, আমাকে বাঁচান।
বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই ---
বাঁচতে চাই তোমাদেরই জন্য।
বাবুমশাইরা, একটু জল দাও
জল, জল, জল ---।

ভাঙার খেলা

হাননান আহসান

বন্ধু হলো পত্রলেখা
বন্ধু হলো মল্লিকাদি
তখন আমার চোখ নেশাতুর
দিনযাপনে ফাটকাবাজি।

আমি ছিলাম ডম্বুরে মেঘ
জুড়ে এল সঙঘমিতা
কলার তোলা মেদ ঝরানো
স্বপ্ন উড়ান কুটুম্বিতা।

সঙ্গোপনে যেই ছুটেছি
হৃদকমলে তুখোড় নেতা
সময় মাপে দূর সীমানা
ক্ষমা করিস মহাশ্বেতা।

নিয়ম বেড়া ভাঙতে ভাঙতে
এগোচ্ছে এক ঘোর বিবাদী
অপ্রগলভ একটা প্রাণীর
জায়গা রেখো অহনাদি।

বন্ধু হলো তত্ত্ব-তালাশ
বন্ধু হলো তস্য গলি
রোদ কপালে বিড়ম্বনা
পাশে থাকিস তিনাঞ্জলি।

সাম্যবাদ

সন্তোষ কুমার সরকার

হাতে কাজ থাকলে কেউ বসে থাকে না ঘরে
চেয়ে দেখো, সবাই কাজ করে বিশ্ব চরাচরে।
এই যেমন নদীর কাজ জল পাহাড় থেকে সাগরে ফেলা!
বাতাস পণ করেছে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যাবে অনেক দূরে!
সেই কবে থেকে আকাশ একা চাঁদ, সূর্য, তারাদের
লালন পালন করছে সন্তানের মতো।
সেটাও তো কাজ!
তবে তাদের কাজে ফাঁকি নেই,
আবার তারা স্বজনপোষণও করে না।
আশ্চর্য ! বৃষ্টি সব সময় সমাজ সেবা করে চলেছে!
কোন ধান ক্ষেতে জল নেই ? বৃষ্টি জল দেয়।
পুকুরের মাছ ডাঙায় পড়ে গেছে,
হাঁসেরা সাঁতার কাটতে পারছে না অথবা পদ্মপাতা, শালুক ফুল বিনা
জলে কষ্ট পাচ্ছে দেখলে বৃষ্টি জল দেয়!
সে গাছে আর ঘাসে দ্বিচারিতা করে না কোনোদিন!
মার্ক্সেসের সাম্যবাদের মতো সবাইকে সমান চোখে দেখে।
কিন্তু মানুষ! অধিকাংশ মানুষের কাজকর্ম ভীষণ পক্ষপাতদুষ্ট।
সব সময় তেলে মাথায় তেল দেওয়া
তাদের চরিত্রের আটপৌরে ব্যাধি।
আমার বৃষ্টি ভালো লাগে,
ন্যায় বিচারে তার জুড়ি নাই।
হে প্রভু! তুমি আমায় বৃষ্টি করে দাও,
আমি বৃষ্টির মতো নিরপেক্ষ হতে চাই।

একুশ

অনিমেষ

ফেব্রুয়ারি একুশ এলে পলাশ আসে
শব্দগুলো ছন্দ পেয়ে মুচকি হাসে
ছোট্ট ঢেউ ছলাৎ ছলাৎ নদীর ঘাটে
দুষ্টু শিশুর মন বসে যায় সহজ পাঠে।
হয়তো বুঝি সেই নদীটাই ধানসিঁড়ি
হিজলগাছে দিচ্ছে উঁকি জোনাক বাড়ি
জেলে ডিঙা যেই ভেসে যায় শিলাইদহে
রান্নাবাটি গুছিয়ে রাখে সোনার মেয়ে।
উদাস সুরে বাজিয়ে বাউল একতারাটি
স্বর্ণচাঁপা, মাধবীলতা, নীল দোপাটি
বাঁশের বনে খেলবে টুকি উতল হাওয়া
শঙ্খচিলের ডানায় ভেসে আসা যাওয়া।
এমন দিনে ঝাপসা হবে চোখের পাতা
সামনে খোলা অ আ ক খ, অঙ্কখাতা
খুশির খেয়ায় মুখ লুকিয়ে কান্নামুখী
বর্ণমালায় আলপনা দি, স্বপ্ন আঁকি।

বিজ্ঞানের জয়

নীলকমল বসাক

চাঁদ নিয়ে প্রতিযোগিতা চলছে
আমেরিকা, চিন ও রাশিয়া
চন্দ্রযান ও দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ
ঐতিহাসিক কৃতিত্ব অর্জনকারী ভারত
প্রত্যেক ভারতবাসীর জন্য গর্বের
এখন ভারত এগিয়ে
এটা বিজ্ঞানের জয়। জয়তু বিজ্ঞান।

চন্দ্রযান-৩ উৎক্ষেপণে ৪০ দিন
কক্ষপথ ঘুরে ভারত প্রথম চাঁদের মাটিতে
পা রাখলো, ভোরের আলো না ফুটতেই
এর আগে দক্ষিণ মেরুতে কোন দেশ পৌঁছোতে পারেনি
মহাকাশ পরাশক্তি রাশিয়া দক্ষিণ মেরু ভেঙে পড়ে
দক্ষিণ মেরু দখল কৌশলগত সুবিধা ভারতে
এটা বিজ্ঞানের জয়। জয়তু বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের ধারণা, অনেক আছে অজানা তথ্য
তাই চাঁদ এখন সম্পদের যান—
চাঁদের জলের স্তর, আয়রন ও ইলেকট্রন ঘনত্ব পরিমাপ
সিলিকন, হিলিয়াম নির্ধারণ করবে মাটি ও শিলার মৌলিক
চলছে প্রতিযোগিতা করে চাইতে কে আগে
কে হবে শীর্ষে সবার তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পাদনা করা
সফল হলে ভারত দক্ষিণ মেরু চাঁদে পৌঁছে যাওয়া দেশ
লুনার রোভার আঁকবে অশোক স্তম্ভ চাঁদের মাটিতে
অপারেটিং রোভার, চিনে সাথে ভারত দ্বিতীয়
এটা বিজ্ঞানের জয়। জয়তু বিজ্ঞান।

ক্লান্তি

শুভ্রাংশু শেখর পাত্র

কোন কিছুই ফেলিনি
দিন দিবাকর- স্নাত মাটি,
শেওলার চাদরে মলিন অন্তজ
জীর্ণ পাঁজরের গোপন ক্ষুধা।

চাঁদ ভরা রাত্রির নীল নীলিমায়
ছোট ছোট নক্ষত্রের অলঙ্কার শোভায়,
জীবনের ওজন কমে আসা ভারবুক
চেনা অচেনা ডাকহাঁকের শিহরণ, স্নেহছায়া
দিগন্তে মিশে যাওয়া কল্পনা
দ্বিপ্রহরে এসে আলস্যই মনে হয়।।

ছুটে যায় প্রান্তর থেকে প্রান্তরে
মানবের লোলুপ ব্যবধানে সরে সরে
যায় সব প্রকৃতের রূপ-মহিমা।।

সব জানার মাঝেও সেই অজানারই অন্তর্ধান
বয়ে বেড়ায়
শোক, তাপ, পরাজয়।

সবকিছু মুছে গেলেও
বেঁচে থাকে অনুভব ।।

সাথী হারা

রাজা বসু

কী তোমাকে বলি বলতো?
নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে
ছিন্নবিচ্ছিন্ন মন নিয়ে
ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে
কীই বা লিখি তোমায়!

কোনো কিছু তোমাকে আর
চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারবো না।
কোনো কথাই তোমার কানে
বলে বলে প্রবেশ করাতে পারবো না।
তুমি দেখতে চেয়েছিলে
অনুর্বর মাটির বুকে ফসলের সোনা সোনা হাসি।
চেয়েছিলে ধুলোবালির প্রতিটি কণায়
জুড়ে থাক পালকের কুসুম-কুসুম পরশ
ছুঁয়ে থাক কাশফুলের পেলবতা মাখা হিন্দোলরাগ
মিশে যাক ভালোবাসার সবকটি রং।

জানতে না তুমি,
কণায় কণায় মিশে আছে শুকিয়ে যাওয়া রক্ত!
তুমি দেখতে চেয়েছিলে -
খোলা চোখে-বন্ধ চোখের স্বপ্ন!
জানতে না তুমি-
বন্ধ্যা জমিতে দেওয়া রয়েছে
চিতা সাজানোর অলিখিত ইজারা।

ভালো থেকো বন্ধু
শান্তিতে থেকো
আমাদের কথা ভেবো না।
বন্ধ্যা জমিতে থাকতে যখন পেরেছি
বধ্যভূমিতেও থাকতে শিখে যাব।

পাঁচ কাহন

কাজল আচার্য

থালা প্রায় শেষ
খিদে কমার কোনো লক্ষণই নেই
ভাতের গন্ধ পরিবর্তিত সন্দেহের ঘ্রাণ
আমি দৌড়াবো দেখে নিও ঠিক
বাঁচার প্রচেষ্টা আপ্রাণ।

পকেট গড়ের মাঠ
কেনা কেনা বাই একই রয়ে গেল
ভিক্ষা থেকে অস্ত্রের চমকানো।
আমি ঘুম থেকে উঠবোই
ভুলে যাও আমাকে ধমকানো।

হাতে নেই তেমন কাজ
ক্রমাগত পকেট হাতড়ে ক্লান্ত
তবে কি ভিন্ন পথ ভিন্ন মতাদর্শ।
ঠিকানাহীন পথে হাঁটতে হবে শেষমেষ?
আর নয় অনেক থেকেছি বিমর্ষ।

মাছের কানকো খুলে দেখেছি জ্যান্ত না...
সবগুলো ঘেঁটে দেখা কঠিন
ভিতরে ভিতরে তৈরি রাস্তা, ফাঁকি।
এভাবেই বেনোজল ঢুকবে খাঁড়ির ভিতর
কখনো বসিনি, কীভাবে আঁকি।

সন্ধ্যে হয়ে এল ফাতনা প্রায় অস্পষ্ট
উঠা নামা বুঝবো কীভাবে
উপরের কারসাজি গভীর না ধরে ফেলে
এতদিন ব্যবধান থেকে গেছে বরাবর
এবার যদি সব বুঝে ডানা মেলে?

বন্ধ্যা

মধুমিতা হালদার

তোমায় বেঁধেছিলাম মনের কোনে কোনো এক অমাবস্যার রাতে।
সেদিনটা ছিল আমার জীবনের নিশিরাত।
অভিশাপ কুড়িয়ে মিথ্যে বুননে পাথর চাপা দিয়ে
হিংসার আশ্রয় নিয়েছিলে তুমি।
বাসর রাতে কাদা মাখা মনে বীজ পুঁতেছিলে।
কোনোদিন তাতে জল দেবে না এমন কথা সেদিন বলোনি।
মরা মাটিতে বুকফাটা তেষ্টায় জল না পেতে পেতে একটা সময়
অঙ্কুরোদগমেই বিলীন হয়ে গেল।
আমি হয়ে গেলাম বন্ধ্যা।
যা সমাজের চোখে দৃষ্টিকটু।
নাম পেল না গাছটা।
নাম না জানা গাছটিতে ফলন ধরল না বলে আজ শুধু নীরবে
একপাশে গুটিয়ে মিথ্যে বদনামের তকমা নিয়ে জড়োসড়ো চোখে
জল গড়িয়ে পা ভেজায়।
সেদিন জিততে গিয়ে হেরে গিয়েছিল এক রঙিন স্বপ্নে।
দাঁড়িয়ে দেখি রুক্ষ শরীরে।
ক্লান্ত হয়ে গেছি আজ আর বেলা বয়ে যায় আমাকে ছাড়াই।

ভালোবাসার গগনতল

সুবোধ সরকার

চোখের মধ্যে আটকে থাকা চোখের জল
সেটাই হল ভালোবাসার গগনতল।

রাখো আমার বুকে আগুন রাখো তোমার মাথা
সেটাই আমার সপ্তসতীগাঁথা।

যখন আমার মন খারাপ, যখন আমি বাষ্প
নিজের ঘর ছেড়ে তখন তোমার ঘরে আসব।

তোমার চোখে একটু জল
ভালোবাসার গগনতল।

চোখের মধ্যে আটকে থাকা চোখের জলে ভাসব
কান্না ছাড়া কী করে ভালোবাসব?

এই পাগলি

রমণী কান্ত পাত্র

মেয়েটি ঘুরে বেড়ায়
সীমাহীন নীল আকাশে
রোদ - ঝড় জলে
অর্ধ উলঙ্গ দেহে
ওই চৌরঙ্গী মোড়ে।
মোড় যেন ওর -
স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল।
জাগ্রত কঙ্কালের মাথা থেকে
ঝুলে পড়া ঝুরি
ঢেকে রাখে বুকের উথল সম্ভ্রম।
ক্ষীণ কটি থেকে দোল খায়
রজ মাখা জীর্ণ বস্ত্র খণ্ড।
ওটাই ওর-
স্থাবর ও জঙ্গম।
মেয়েটি কী খায়?
কে জানে?
তবে, কচিদার চটি গিলে খাওয়া ড্রেনে
ঝরে পড়া হলুদ দানা
খুঁটে খাওয়া -
ওর খুব প্রিয়।
মেয়েটি কী বলে?
কে জানে?
গরম জলে চাল ফোটা শব্দ ওঠে
অধর আর ওষ্ঠে।
অদৃশ্য কারো সাথে বসন্তের কথা রেশে
খিল খিল করে শুধু হাসে।
পরক্ষণে, পাহাড় ভাঙা হিমগলা স্রোতে
ভেসে যায় -
চুড়ি ভাঙা প্রেম।
মেয়েটি রামের না রহিমের -
কে জানে?
নাম তার রাধিকা না লায়লা
নেই তার মনে।
শুধু, মারিয়ানা চোখ দুটো
সাড়া দেয় -
'এই পাগলি '- ডাকে।

ভান

সমরেশ মুখোপাধ্যায়

আমরা কেউ কাউকে চিনি না
নিজেকেও চিনতে পারি না দিনের পর দিন
শুধু চেনার ভান করি
যে আমার সামনে আজ বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিল
কাল সে ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে যেতে পারে
আজ যে আমাকে আলিঙ্গন করছে
কালকেই সে আমাকে ছুড়ে ফেলতে পারে
আজ আমার যে ছায়াটাকে মনে হচ্ছে নিষ্পাপ
কালকেই সে হয়ে যেতে পারে পাপী
আজ যাকে মনে হচ্ছে নির্লোভ
কালকেই সে লোভী ও হিংস্র হয়ে উঠতে পারে

আসলে আমরা কেউ কাউকে চিনি না
এমনকী নিজেকেও
শুধুমাত্র চেনার ভান করি!

সোহাগ হৃদয়

পূবালী চট্টোপাধ্যায়

কল্লাজ পাথর রঙে পেলব শরীর বাঁধন,
কালো খোঁপায় কৃষ্ণচূড়ার আগুন মাতন।
চঞ্চল দুটি চোখ পটভূমি ছুঁয়ে যায় আনমনে,
প্রশান্তি খুঁজে পায় প্রকৃতির প্রগাঢ় আলিঙ্গনে।
চিকন গায়ে লেপ্টে থাকে বন্য সতেজ সবুজ
ধুলোপথ হেঁটে যাওয়া, আলতা রাঙা সহজ।
গঙ্গাফড়িং আহ্লাদে জল ছুঁয়ে উড়ে যায়,
পায়ের পাতা শব্দ চেনে সোহাগ হৃদয়।
মহুয়ায় নেশা চোখ, মাদল তালে নাচ,
ভালোবাসা ঝলক, বেলোয়ারি চুড়ির কাচ।

মমতাময়ী মা

ক্ষিতীশ বর্মণ

শরতের স্নিগ্ধ, হিমেল বাতাস,
বহে চারিদিকে, আগমনির আভাস।
'শারদীয়া', মায়ের আদুরে নাম,
এই নামেতে খুশি, মাতৃকুল ধাম।
আকাশে বাতাসে, আগমনী বার্তা শুনি,
ফুলদলে, পাখি কূজনে বন-বনানী।
স্নেহ মধু আনন্দে, উদ্বেলিত ভুবন,
উজ্জ্বল জ্যোতিপূর্ণ, আলোকিত গগন।
শ্রদ্ধা ভক্তি গগনভেদী, মহালয়ের সুরে,
শোক তাপ কলুষ, সরে যায় দূরে।
কৈলাস হতে, মায়ের আগমন,
ধরা হাসে, আনন্দে জাগে উদ্দীপন।
শারদীয়া মা আমাদের, ঘরের মেয়ে,
আছেন চিত্তে তিনি, মমতায় ছেয়ে।

সভ্যতার কাছে নত

রাজকুমার দাস (কলকাতা)

এক জীবনের ছন্দপতন ঘটনা...
বেআব্রুর সভ্যতার কাছে নগ্ন;
পৃথিবীর গ্রহে কলঙ্কের ক্ষতচিহ্ন
আগামীর কাছে যেন অন্ধকার ছায়ার স্বপ্ন!

সৃষ্টি সন্ধান নবদিগন্তের আভ্যন্তরীণ প্রান্তে
ছোটাছুটি কেবলই এক প্রয়াস মাত্র,
দগ্ধতার দাবানল সর্বত্রে করেছে গ্রাস
শিক্ষার প্রসার ক্ষীণভাবে জীবন অতিষ্ঠ।।

নীরব যত কষ্টের কাছে করে মাথা নত
শেষ থেকে শুরু করার আন্দোলন
প্রেম দিয়ে জিতে নেব দুনিয়ার হিংস্রতা
বিশ্ব মাঝে গড়ে উঠবে একদিন ভালোবাসার মহামিলন।।

উমা

অনীশ

আশ্বিনের কৈশোরে চঞ্চলতা বড়ই আবশ্যক
যতদূর দিগন্ত ছুটে গেছে সূর্যের শিকড়ের খোঁজে,
সেখানে সন্ধান পাই আমি সেদিন সন্ধ্যার; অথবা কোনো
যুবতীর কোমল আশ্রয়। আজ বুঝি তোমার ইচ্ছে?
সারবন্দি গাছের সমস্বর নিস্তব্ধতা একা শুনেছি
রামধনুর শেষ দেখব বলে, সমুদ্রতীরে আমিই তোমার ছায়া।
মুছে যাওয়া ভাদ্রের শেষ পিচ্ছিল রাস্তায়, তুমি কেন...
হাত বাড়াও... এই শ্রান্ত পাথরের জগৎ ছেড়ে চলো;
হাত বাড়াও... আসবে? যদি নিয়ে আসি তোমায়
চৌকাঠের এপার? আমার এদিকে প্রত্যেক সবুজের ফাঁকে
কিছু কাশফুল জন্ম নিয়েছে; যেমন তোমার স্পর্শে জন্ম আমার।
প্রত্যেক শরতে তুমি দেখা করে চলে যাও, আমি বুঝি পর?
হাত বাড়াও এই শরতে আমি তোমার হাত ছাড়ব না।
শুনতে পাচ্ছ? এদিকের শিউলি আর ছাতিমের কানাকানি?
তোমার অনুপস্থিতি এখনো মেঘের প্রলয় ডেকে আনে!
কতদিন আমি জ্যোৎস্না দেখিনা, হাওয়া মাখিনি শরীরে;
কতদিন আমি তোমায় অনেকক্ষণ কাছে রাখি নি...
হাত বাড়াও... এসে দেখে যাও
রামধনুর শেষে, তোমার দিগন্তের শুরু।।

প্রিয়জন

শতাব্দী চক্রবর্তী

কী দিয়ে সাজাই বল তো তোকে
মেঘনা জল, সোনার টিপ, আগুন ফল?

কী বেড়ে খাওয়াই বল তো তোকে
পায়েস দুধ, আমের রস, কাতলা-রুই?

কেমনে সাধি বল তো তোকে
গোলাপ ফুল, দু'চোখ প্রেম, সোহাগ জল?

কী করে বলি বল তো তোকে
যতটা পৃথিবী রয়েছে আমার, ততটাই তুই।

আয়না

অরুণাংশু ব্রহ্ম

সকলের কাছেই একটা আয়না আছে
আমরা নতজানু হয়ে
আয়নাটিকে সামনে তুলে ধরি
বেঁধেফেলি নির্দিষ্ট সীমানায়
চোখ দেখি, মুখ দেখি, মন দেখি
আবারণহীন আমার অস্তিত্ব ফুটে ওঠে,
শব্দলোকের উচ্চারিত শব্দ থেমে যায়,
তখন আয়নার ভিতরের প্রতিবিম্ব
নানান প্রশ্ন মালায় জর্জরিত করে
পূর্ণতা অপূর্ণতা ভুলে নানা প্রশ্নের
বুদ্বুদ উঠে আসে একের পর এক,
তোমার স্বরূপ কি? তোমার স্থান কোথায়?
মনন গন্ডির বাইরে তোমার স্থিতি?
ভাবতে থাকি , এক একটি ক্ষুদ্র প্রশ্ন চিহ্ন
তাড়া করে, সন্দিহান মন পালতে থাকে
পৃথিবীর অনন্ত প্রাণের মাঝে
অস্তিত্ব সঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে?
আমি দ্বিধা দ্বন্দ্বে আয়না ঢেকে ফেলি
বিষন্ন বিহ্বল মন চোখ বুঁজে থাকে।
মুখ আর দেখা যায়না, তখনি দুই পাড়ে
সব আলো নিভে যায়, অন্ধকার আসে নেমে।

সবাই জানে সত্যবাদী সে
বাথ্যার স্রোতে সকল ঝঞ্ঝা মাঝে
সাহস যোগায় সত্যি কথার ছলে ,
ভোরের বেলায় আলো আঁধার সন্ধিক্ষনে
আপার কৌতূহলে আয়নাটিকে উন্মুক্ত করি
আবার চোখ দেখি, মুখ দেখি, মন দেখি
সে একাই অন্ধকার ছেঁকে আলো তুলে আনে
ঝলমল করে ওঠে, অন্ধকার নিমেষে মেলায়।
তারপর উদাত্ত আলোর বন্যায়
ভেসে যায় যত অবক্ষয়ের মানুষ,
অভিমানে আচ্ছাদিত ঘন মেঘ,
একপৃথিবী সমাজ,অহংকারের ফানুস।
উত্তরণ পথের জানলা খুলে রাখি
আলোর স্রোতে আলোর মাঝে রই,
আমরা সবাই আপন স্থানেই আছি
কারোর পিছনে কারোর সম্মুখে নই।

ভাগ্যবানের আত্মকথা

প্রদীপ আচার্য

ও আকাশ, ভাগ্যিস তুমি ছিলে
নইলে উদারতা জানতাম না
ও সমুদ্র, ভাগ্যিস তুমি ছিলে
নইলে গভীরতা জানতাম না
ও পাহাড়, ভাগ্যিস তুমি ছিলে
নইলে উচ্চতা জানতাম না
ও নদী, ভাগ্যিস তুমি ছিলে
নইলে গতিধারা জানতাম না
ও মহীরুহ, ভাগ্যিস তুমি ছিলে
নইলে আশ্রয় জানতাম না
ও মানুষ, ভাগ্যিস তুমি ছিলে
নইলে পরমাত্মীয় জানতাম না
ও বিশ্বাস, ভাগ্যিস তুমি ছিলে
নইলে গর্ভধারণ জানতাম না
ও মুখোশ, ভাগ্যিস তুমি ছিলে
নইলে প্রতারণা জানতাম না
ও সেলফোন, ভাগ্যিস তুমি ছিলে
নইলে মিথ্যাচার জানতাম না।

হেরে যাওয়াগুলো

অরিজিৎ চক্রবর্তী

বিশ্বাস করো, এ জীবন খুবই সামান্য তোমার জন্যে। এই যে মরে বেঁচে আছি আর চেঁচিয়ে জাহির করছি ক্ষুধা তৃষ্ণার মতভেদ... তাকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। সুতরাং অচেনা নৈকট্য তোমাকে প্রযুক্ত করবে এটাই স্বাভাবিক। চলে যাব। শেষ দেখায় কফি কাপে ধোঁয়া উড়বে না। কেবল একটা গোপনতার নেশায় বুনশ্যেন ল্যাম্পের বিস্ময় আলো ব্যাকুলতার দিকে ছড়ানো থাকবে।

পরিবর্তন

সুপ্রীতি দত্ত

সকাল থেকে রাত,
মোবাইলে হাত।
মুখপুস্তিকায় সাক্ষাৎ,
শুভরাত্রি আর সুপ্রভাত।

অচেনা সব বন্ধু এখন,
হলে পরে বোঝে তখন।
পাল্টে গেছে সময়,
এই রোগের নেই নিরাময়।

একাকিত্ব প্রধান কারণ,
জীবনের সমীকরণ।
সুখ খুঁজতে যায়,
মরীচিকা হায়।

মুনিয়ার মূল্যবোধ

মানসকুমার ঠাকুর

মুনিয়া যখন বাগানের দরজা খুললো
তখন মহাসপ্তমীর ঢাক বাজছে,
গ্রামের লোকজন বাচ্চা থেকে বুড়ো
সবাই আসছে নতুন পোষাকে, নতুন সাজে।
সবাই মায়ের কাছে হাত জোড় করে কত কিছু চাইছে -
কেউ রূপ, কেউ ধন
কেউ বা শান্তি কেউ বা টাকা,
কিন্তু দশ বছরের মুনিয়া!
কী চাইবে সে! কার কাছে!
মুনিয়ার মা তো - মাটির মা নয়
মুনিয়ার মায়ের হাতে তো-- নাই ত্রিশূল
মুনিয়ার মায়ের - না আছে অসুর।
মুনিয়ার আছে বিছানায় শুয়ে থাকা, এক মা
উজ্জীবিত - প্রাণবন্ত মা,
যার কাছে চাইলে - পাওয়া যায় শুধু নীরবতা,
শুধুই চোখের জলের আশীর্বাদ।
মুনিয়ার বাবা - 'অভিমুন্য' -
সে চলে গেছে গত পুজোতে--
প্রাণবন্ত মাকে ফেলে -
আর মুনিয়া! সে কোথাও যায়নি
সে তার সব শখ ডুবিয়ে দিয়েছে - বিলের জলে
পানকৌড়ির মতো সে — ডুব দিয়েছে মা - ভজনাতে।
গত পুজোতেও — জামা পড়ে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিল মুনিয়া
এবার জামা কেন ?
খাবার জোগাড় করতে, মায়ের পথ্য - সে অনেক চিন্তা।
বাগানে ঢুকে - সব পরিষ্কার করে - নোঙরা পাতাগুলোতে
সে আগুন দিয়েছে-
হঠাৎ
দুর্গার মা চেঁচিয়ে ওঠে,
"ওরে হতভাগা, মেয়েটা আমার ঘুমাচ্ছে
মেয়েটাকে দেখে তোর কষ্টও হয় না।"
দুর্গা মুনিয়ার থেকে দু-চার বছরের বড়ো হবে,
সত্যি তো সে বাচ্চা
মুনিয়া তো হিসেব জানে না।
মুনিয়া তাড়াতাড়ি চেষ্টা করে হাত পা দিয়ে আগুন নেভাতে
কারণ -

দুর্গার কষ্টটা তার মায়ের কাছে পৌঁছেছে —
মুনিয়ার তো সে কষ্ট নেই
মুনিয়ার কষ্ট তো তার মায়ের কাছে পৌঁছোয়নি,
মুনিয়া যখন কালো হাত দুটির দিকে তাকালো
মনে হল ওর মাও এই ভাবেই মনের জ্বালা নিয়ে জীবন কাটাচ্ছে।
আর আমি !
এক টুকরো আগুনের ছটায় এত চিন্তা করছি,
সত্যিতো দুগ্গা দিদির কষ্টটা অনেক বেশী।
কালো ধোঁয়াটা ঘরের ভেতর ঢুকে ঘরের হাওয়াকে নষ্ট করতে পারে
আমাদের ঘর তো বন্ধ নয়
খোলা আকাশ, গাছের ছায়া সবই তো আমাদের।
আমাদের চেয়ে ওদের কষ্ট অনেক বেশি,
দু'জনের মধ্যে ফারাক অনেক
এক জনে মায়ের হাত ধরে মাটির মূর্তির কাছে চাইতে যাবে
অন্য জন নিজের পায়ে হেঁটে জ্যান্ত মূর্তির কাছে আশীর্বাদ চাইতে যাবে।
মুনিয়ার কাছে অনেক জরুরি
চারটে বাড়ি থেকে চারশো টাকা জোগাড়
মায়ের শাড়ি, মায়ের পথ্যি, খাবার।
সব শেষে যদি কিছু থাকে ---
প্রশ্ন ধেয়ে আসে - আমরা কারা !
আমাদের অবস্থান ! আমাদের সংকল্প !
সত্যি কি মৃন্ময়ী মায়ের চোখ স্থাপন হয়
যদি বা হয়
মৃন্ময়ী মা'র দৃষ্টি কত দূর যেতে পারে !
মণ্ডপ ছাড়িয়ে - বাগানের অন্ধকার স্থানে !
যেখানে মুনিয়ার মতো ছেলেরা জীবনযাপন করেছে তারই চিন্ময়ী মায়ের জন্য।
সত্যি কি আমরা বিচার জানি
কেনই বা মনে এত লোভ, এত জঘন্য।
মুনিয়া তার বিবেকের কাছে কত পরিষ্কার
কত ত্যাগ তার মনে,
সমাজ সংকল্পকে কী সুন্দর সে জানে।
কিন্তু যারা বিচারক
তারা তো আলো ছাড়া কিছু দেখতে পায় না।
পায় না বলেই মুনিয়ার মতো ছেলেরা অপাংক্তেয় - অস্পৃশ্য !
বহুদিন আগে
রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছিলেন
"তোমাদের চৈতন্য হোক" —
আমরা আমাদের চৈতন্যর জন্য অপেক্ষায় থাকলাম
চাওয়া-পাওয়ার অকাল বোধনে।

ছোটো গল্প—

পরিযায়ী

শুভ্রজিত সরকার

ছেলে কাছে গিয়ে জানতে চাইল, বাঁশ কেন কাটছ?

খাটিয়া বানাবো বলে--- মুখ নীচু করে মন দিয়ে নিখুঁত করে গাঁটগুলো চাঁচতে চাঁচতে নির্বিকারভাবে বললেন বাবা।

-- খাটিয়া, সেটা দিয়ে কী হবে?

—কাল মরব। বেশ পোক্ত করে বানাচ্ছি, তোদের যেন অসুবিধা না হয়। প্রত্যয়ের সাথে ছেলের চোখে চোখ মেলালেন।

আঁতকে আত্তারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড়। বলো কী? কী করছ? মাথাটা কি খারাপ?

-- ও মা আ... মা আ আ

কথা শেষ হয়নি। কাটারি উঁচিয়ে কেমন তেরিয়া হয়ে তেড়ে আসেন বাবা। ভগীরথ দলুই। বাবার এই অচেনা মূর্তিতে ভয় পায় সুবল। মাকে ডাকতে ডাকতে সোজা ঘরে। মায়ের পিছনে ছোটোবেলার মতো নিরাপদ আড়ালে।

তোমার হল কী? বোধগম্মি কি চুলোয় দিলে? প্রতিমা খুন্তি হাতে বাবা ও ছেলের মাঝ বরাবর দেওয়াল হল। মুখ ভেঙচে বলে ওঠে, "অ্যাঁ, দা হাতে তেড়ে আসা হচ্ছে! ন্যাকা - এখানে একটা জুতসই গালাগাল বসিয়ে অকর্মণ্যের ওপর গায়ের ঝাল মেটালেন।

বাবা আহত চোখ নামালেন। আবার কাটারি নামল বাঁশের ওপর। নির্বাক গম্ভীরভাবে পটুহাত চলতে থাকে ঘন পিত্তিরঙা নিরেট তেলা বাঁশের গায়ে।

ওই প্রতিমাই আছে তার অভীষ্ট পথের পলকা বাধা। ওর কথা এ যাবৎ অনেক ভেবেছেন। কিন্তু কোনও কিনারাই করে উঠতে পারেননি।

বড়ো ছেলে মাকে বেশী ভালোবাসে। ছোটোখাটো শলা পরামর্শে মায়ের মতামত খাটে। তবে সে বউ আর মায়ের টানাটানিতে পড়ে মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়ে যায়। ছোটোটারও মায়ের দিকে ভার আছে। তবে ইদানিং বউয়ের দড়ি শক্ত হচ্ছে আলগা হচ্ছে উল্টোদিক। বাবার সঙ্গ তো পায়নি বড় একটা। তিনি বরাবরই পরিযায়ী।

দুই

সকালে ফোনাফোনিতে খবর এল বান্দ্রা থেকে ট্রেন ছাড়বে। বাংলা, বিহার আর ক'জায়গার জন্য। খবরটায় ভগীরথের কেমন খটকা লাগে। দূরপাল্লার ট্রেন ওখান থেকে সচরাচর

ছাড়ে না।

লকডাউনের আজ মাস পেরোলো। ক'দিন ধরে মন বড়ো অস্থির হয়ে আছে। বাড়িতে ফোন করলে প্রতিমা শেষের দিকে নাক টানছে। কথা জড়িয়ে আসছে। কাঁদছে মনে হয়। ছেলেদের মনোভাব আন্দাজ করা যাচ্ছে না। মুখে অবশ্য বড়ো বলছে, "বাবা তুমি যেভাবেই হোগ চলে এসো। আমরা এখন সিয়ানা। এধার-ওধার করে ঠিক চালিয়ে দোব। তাছাড়া আমাদের রেশনকাড আছে। ছ'মাস মাগনা চাল দেবে, পঞ্চচাত থেকে তোমার কাডও বানিয়ে দেবে বলেছে। মেম্বারের সাতে কতা হ্যোচে। গোটা দুই জবকাডের ব্যাবোস্তা হলেই... তাচাড়া এখন মেলা ভাতা দিচ্চে। ঝানডা ধরে পার্টির দাদার পোঁ ধরলেই যাহোক একটা কিচু হয়ে যাবে'।

মন খুব উথালপাথাল হয়। দেশ-গাঁ ফেলে অনেককাল হল। আরামের বড়ো লোভ হয়। সেই কোনকালে সেয়ানা হওয়ার আগে হারানকাকার সাথে কেরালা গিয়েছিলেন। তখন দড়িবাঁধা প্যান্টুল। তালুর উল্টোপিঠে সর্দি মুছে মায়ের এককথাতেই রাজি হয়েছিলেন। তিনিই সবার বড়ো ছিলেন। বাপের টিবি ছিল। হেলথ সেন্টারের চিকিৎসায় ফিরিতে অসুদ পেলেও পথ্য জুটত না। ঠিকে ঝি মায়ের উপায়ে পাঁচপেটের আধা জ্বালাও জুড়াত না। মায়ের অনুরোধে হারানকাকা রাজি হলে ছোট্ট ভগা আর কথা বাড়ায়নি। হারানকাকাও দল গড়ছিলেন, আর ভগাও ওই আধপেটা অনাহার থেকে রেহাই চাইছিল।

প্রথমে হারানকাকা বেশ আতান্তরে পড়েছিলেন। কোন কাজে লাগাবে একে? অপুষ্ট প্যাঁকাটির শরীর কোনো কাজেরই উপযুক্ত নয়।

প্রথমে রাঁধুনির হেল্পার। জলতোলা, কাঠের জোগান, উনুন ধরানো, আনাজ কাটা, বাসনমাজা দু'বেলা। প্রথমদিকে সাধ্যাতীত হয়ে উঠত। আধপেটা প্যাঁকাটি শরীর বাঁধ সাধত। কিন্তু বাপ-মা, ভাইবোন, বাড়ির অবস্থা সাদাকালো পর্দায় জেগে উঠতেই পেটপুরে ভাতের আশায় দাঁত চেপে পড়ে থেকেছেন ভগীরথ। লড়াইটা ছিল পেটের, সম্পূর্ণ পরিবারের জন্য।

বাঁশের টুকরোগুলো গুনে নেন। বিড়ির জন্য মন আনচান করছে। গুনে খেতে হয়, এক প্যাকেটে দু'দিন চালাতে হবে। বিড়িতে টান দিয়ে একদলা ধোঁয়া ছেড়ে আবার ধোঁয়াশা অতীতে ঢুকে পড়েন। আট-নয় মাস পরে বাড়ি ফেরার সময় জমানো টাকায় স্বপ্ন থাকতো। কোনওবার বাড়ির পাকা দেওয়াল, পরেরবার টালির চাল, জমি-জায়গার কাগজপত্তর সবই পাকা করেছিলেন। পরিবার হল পোক্ত। কিন্তু রইল কোথায়! ছোটো ভাইয়ের বিয়ের বচ্ছর ঘুরতেই বউ চক্করে সে ভেন্ন হল। এখন মুখ দেখা নেই। বোনও তাই। ননদ-ভাজে দল পাকিয়েছে। দু'ভাইয়ের মাঝে চুলচেরা ফাটল এখন নদীর ভাঙন। সে এখন ভাই-দ্বিতীয়ায় ভাইকে শুধু ফোঁটা দেয়। আর ওই বোনের জন্য ওর খাওয়াপরা-লেখাপড়া সেখান থেকেই বে'পতে। এক লম্পটের পাল্লায় পড়ে। ওই খাদ থেকে তুলে এনে বিয়ে। নগদ, গয়না। মনটা হু হু করে ফোঁটারদিন। বেঁচে থাকতে আর ইচ্ছাই করে না।

অদক্ষ প্যাঁকাটি হেল্পারই ধীরে ধীরে প্রশিক্ষিত। তারপর কাল'বেয়ে পাকা রাঁধুনি। নাম ফেটে গেল। ফেনাভাত থেকে বিরিয়ানি সবকিছুই নিপুণ হাতে রপ্ত হল। অনেকেই চাইত এদলের সদস্য হতে, পুরোনোরা তো ছাড়তেই চাইত না।

সে হাঁড়ি আজ তিনদিন চড়েনি। চড়াতে পারেইনি। চাল-ডাল, নুন, তেল, গ্যাস, পয়সা জায়গারও অভাব। উনিশ-কুড়িজন লোকের দশ বাই পনেরো মাপের পরিত্যক্ত দোকানঘরে সহবাস। সাটার ফেললেই বদ্ধ আর তুললেই ঝাঁঝাঁ রাস্তায় লকডাউন। সারাদিন ব্যস্ত পুলিশের গাড়ি আর হুটার বাজানো অ্যাম্বুলেন্স। ভেতরে করোনা রোগী। মাথা থেকে পা অবধি প্ল্যাস্টিকের জামাপ্যান্ট পরা ড্রাইভার। আর ট্যাঁ....এ....ট্যাঁ....এ আওয়াজ শুনলেই ভেতর শুকিয়ে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির জন্য আনচান বাড়ছে। চারিদিক খাঁ খাঁ নিস্তব্ধ। তবে কি আর বাড়ি যাওয়া হবে না?

-- কী গো ভগাদা রেডি হওনি? গোপাল ঠ্যালা মারে। সে বাইরের ভাড়ার পায়খানায় লাইন দিয়েছিল। একেবারে চান সেরে ফিরেছে। এক লাফ মেরে ওঠে ভগা। সে প্রাতঃকর্ম সেরেছে রাত থাকতে। হাতল ছেঁড়া পিঠটু ব্যাগে লুঙ্গি ভিজে গামছা ঠুসে পোরে। ব্যাগটা ভরা পোয়াতির মতো হাঁসফাঁস করে ককিয়ে পিঠে ওঠে। সবার পেছু পেছু এগোন ইস্টিশানের দিকে।

তিন

হাঁটাই স্থির করেছে ওরা। এ এক্কেবারে অসম্ভব ব্যাপার। মন শরীর কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। দেড়-দু হাজার কিলোমিটার হাঁটা তো অসাধ্য। আবার এই বদ্ধ খাঁচায় থাকাও দিনে দিনে কঠিন হয়ে উঠছে। আগে দু'শিফটের দিনে বারো আর রাতে দশ লেবারের কাজের ব্যস্ততায় গা ঠেকাঠেকিতে সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন হাত-পা ছড়ানোই কঠিন। পেটে খিদে, দিনে কাজ আর রাতে ঘুম সবেতেই লকডাউন। এক একটা দিন যেন যুগের চেহারায় পার হচ্ছে।

মনের ছটফটানি বাড়ছে। খবর আসছে রোজই, আশেপাশের অনেক দলের লোকেরাই হাঁটতে শুরু করেছে। ট্রেন কি আর চলবে না? সে ও কি তবে... এখানে থাকাও দুষ্কর হচ্ছে ক্রমে। রাস্তায় বেরিয়ে গাছতলা তো পাওয়া যাবে।

সামাজিক আর দৈহিক দূরত্ব কী জিনিস এতকাল কারোরই জানা ছিল না। কেরালা, বোম্বে, মাদ্রাজ প্রতিবারই ট্রেনের জেনারেল বগিতে যাতায়াত করেছেন। এর ওপরের কামরাগুলোতে পয়সা বেশি লাগে। এটা ওদের কাছে বিলাসিতা। এই কামরায় গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি করে মেঝেতে শুয়ে দু-তিন দিন চান না করে, গন্ধওলা টয়লেট ব্যবহার করে বাড়ি ফিরেছেন।

বছরখানেক আগে বাড়ি ফিরে খবর কানে এল পঞ্চায়েত থেকে কিছু সরকারিভাতা পাওয়া যাবে। ছুটলেন ভগীরথ আরও অনেকের সাথে। আধার কার্ডের জেরস্ক নিয়ে। অপিসের সামনের মাঠে মেলা লেগেছে। বাঁশ খাটিয়ে তিরপলের অস্থায়ী প্যান্ডেল। তার নীচে তিনটে লাইন- ফরম তোলা, চেক করা আর জমা দেওয়া। লাইনে বড়ো, মেজো, ছোটো নেতা আর তাদের খুড়তুতো, পিসতুতো, মাসতুতো ভাইয়েরা। ওরাই লাইন ঠিক করছে আবার ওরাই বিনা লাইনে ফিরির ফর্ম জোগাড় করে দিচ্ছে বিশ-পঞ্চাশের বিনিময়ে। ভরেও দিচ্ছে ওদেরই লোক, আরও চার্জ। ভিড় এড়াতে যায় যাক দু'একশো। খসলোও, চেক করার লাইন আর ফরম ভরার জন্য।

সপ্তা দুয়েক কাটলো, মাস গেল। গাঁয়ের বাজারে অনেক আলোচনা, সমালোচনার ঝড় বইল, থেমেও এল। শুধুই চোনায় চোনা, আলোর রেখা মিলল না। দেহ উল্টো আচরণ শুরু করল। মাথা ঘুরছে, শরীর টলছে। হাসপাতালের আউটডোরে লাইন দিলেন। পেসার মেপে ডাক্তারবাবু গম্ভীর হলেন। কাগজে খসখস করে কিছু লিখে সাদা মতো বড়ি দিলেন, রোজ সকালে জলখাবারের পর। রক্তের কতগুলো পরীক্ষা করা দরকার। হয়নি, পকেটে টান। নিজের চিকিস্যের জন্য ছেলেদের কাছে হাত পাততে সঙ্কোচ, তবু প্রতিমা কথা পেড়েছিল। এ গুরুত্বহীন কথার কোন মূল্যই নেই ছেলেদের কাছে।

একবার বি ডি অপিসে গিয়েছিলেন খোঁজ নিতে। অপিসারবাবু বাতিল লিস্ট আগে চেক করলেন। সংখ্যা কম, ঝামেলাও।

- তোমার তো ভোটার লিস্টে নামই নেই। মৃতের তালিকায় পড়েছো ! চেক করে অফিসবাবু জানালেন। কথা'কটা বলেই অন্য কাগজে মন দিলেন। মৃতলোক নিরাকার, তার অস্তিত্বকে পাত্তাই দিল না। মনটা বড্ড তেতো হয়ে গেল। তিনি পরিযায়ী। ভোটারলিস্ট বানানোর সময় এখানে ছিলেন না। একথা শোনার মতো অবসর কারোর নেই। ফেরারপথে একটা সুনশান স্থানে হাপুস নয়নে কাঁদলেন। একান্তে, নিজের জন্য। সে এখন জীবন্ত লাশ।

চার

বোম্বে যাবার জন্য বারবার ফোন আসছে। এদিকে কী একটা চায়নারোগ ছড়াচ্ছে চারিদিকে। খুব ছোঁয়াচে, সস্তার চায়না মালের মতো। কেরালার দিকে সবে শুরু হয়েছে। বয়স্ক লোকেদের এখন বাইরে যেতে মানা করছে। সবার চোখে

কলেরা মহামারীর আতঙ্ক। টিভি'তে নাকি সে রকমই বলছে। বোম্বে যাওয়ার জন্য বারবার বলছে, কী করি বলতো? গড়িমসি করে কথাটা দুপুরে ছেলে, গিন্নির সামনে পাড়লেন।

"বাড়ি বসে অন্ন ধ্বংসাচ্চো। কাজে ডাকলে বেরিয়ে পড়ো। মাইনে ছাড়া থাকাখাওয়া...." ছোটোছেলে ভাতের গাল মুখে পোরায় শেষেরদিকে ছেদ পড়ল। বড়োছেলেরও সায় রয়েছে। প্রতিমা খালি মাঝের খাদে পড়ে কাতরায়। দু'গাল ভাত গলা দিয়ে নামলো পেট অবধি গেল না। মাথা আবার ঘুরছে। শরীর টলছে। রোজগার নেই তাই 'অন্ন ধ্বংসের' কথা উঠছে। শরীর কেমন ঝিম মেরে গেল। আবার একটা নির্জন জ্যায়গায় যেতে পারলে ভালো হত। নিজের জন্য। মনটা হাল্কা হত। একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। বারান্দার তক্তপোশে শুয়ে বালিশ ভিজে গেল। সন্ধ্যা উতরে রাতের দিকে মিসড কল গেল অজয়দার নম্বরে। ব্যালেন্স নেই। অজয়দা ফোন করলে তিনদিন বাদে বোম্বে যাওয়া পাকা হল।

বিড়ি নিবে গেছে। মাপ করে বাঁশ কাটা শেষ। নিজের হাইটের থেকে ছ'সাত ইঞ্চি বেশি রাখতে হবে। বাঁশের টুকরো দাঁড় করিয়ে মেপে নিলেন নিজের সঙ্গে। এবার ফাটিয়ে বাখারিগুলো রেডি করতে হবে। তারপর পেরেক মেরে...

যাওয়ার খরচ আর খোরাকি অজয়দাই দিল। পরে কেটে নেবে। প্রতিমা বড়োছেলেকে বলেছিল সে গা'করল না। বাদল ব্যাপার আঁচ করে এদিক মাড়ায়নি। খুব ভোরে কাজে বেরিয়েছে আর ফিরেছে রাত করে।

বোম্বে পৌঁছে স্বস্তি এলেও শরীর সাথে ছিল না। মানসিক চাপ আর শরীরের অনেকগুলো কলকব্জার বিশৃঙ্খলা সংঘবদ্ধ হচ্ছিল। অচিরে তা বেরিয়ে এল। মাথা ঘুরে ডালের কড়ায় আর একটু হলেই... ভজা না ধরলে... ডাক্তার, হাসপাতাল ভোগান্তি সবই বেশ লম্বা হল। খরচ বাড়ল অজয়দার। ভগা হেঁসেল সামলায়, রসদে টান পড়লে কোনও কাজই এগোয় না। প্রেসার ছিল, এবার তার দোসর হল সুগার। সকাল, দুপুর নিয়ম বেঁধে ওষুধ আর বিশ্রামের দরকার। বাড়িতে খবর দিতে বারণ করেছেন সব্বাইকে। প্রতিমার ফোন এলে বলছেন ভালো আছি। হাসপাতালে শুয়েও বললেন একই কথা।

বিশ্রামের জন্য তো এত দূর আশা নয় তাই ওটাতে ছেদ পড়ল। কিছুদিন বাদে ওষুধেও টান, পয়সার অভাবে। তাই ভয় হয়, দুঃশ্চিন্তা বাড়ে। রাস্তায় হাঁটতে পারবেন তো? অসুস্থ হয়ে পড়বেন না তো অচেনা অজানা জায়গায়, কারোর বোঝা হয়ে পড়বেন না তো?

পাঁচ

একটা ফলের গাড়ি জুটে গেল। রায়পুর অবধি। খালি ছাড়লেও রাস্তায় লোড হবে। নাগপুরে কমলা, নাসিকে আঙুর-কিসমিস, ভুসয়ালে সিঙ্গাপুরী কলা। তখন একটু অসুবিধা হবে। এ্যাডজাস করতে হবে। রাতগুলোয় চলল টানা, দিনেরবেলা হাইরোডের পাশে দাঁড়িয়ে রান্না, খাওয়া আর ঘুম। ভগার রান্না ডিমেরকারি খেয়ে সক্কলে হাত চাটলো। প্রশংসায় মন ভরলেও লম্বা সফর আর মসলাদার খাবার দুয়ে মিলে ভগার শরীর বিগড়ে গেল। দেহে যুদ্ধ শুরু হল ভেতরে ভেতরে। সঙ্গীরা জানতেও পারল না। তিন-চার দিন লাগল রায়পুরে পৌঁছোতে। শেষেরদিকে কষ্টের সীমা ছিল না। লোডগাড়িতে একোনা ওকোনা করে কোনোক্রমে। রায়পুরে নেমে একটু সুস্থ বোধ হলে হাঁটার সাহস এল।

অর্ধেক বাখারিগুলোতে পেরেক মারা হয়ে গেছে। কিছুটা বাকি রয়ে গেল। পেরেক কম। এখনই বাজারে যাওয়া দরকার। দুপুরে দোকান বন্ধ। কাজগুলো এ বেলাই শেষ করা দরকার।

রায়পুরেও আবার ওপরওলা সহায়। এবার দুধেরগাড়ি। প্রায় বাংলায় ঢুকে যাবে। কিছু পয়সা নেবে এবারও। সেখান থেকে নিজের গ্রাম। বাড়ি। এখনও নিজের আছে? জ্যায়গা তো নিজের। হোক না টালিরচালা। উঠোনের কাদায় সবুজ ছ্যাতলা। জোড়া জোড়া ইটপাতা। পাশের পুকুরে হাঁস চড়ে, সারাদিন প্যাঁকপ্যাঁক। বর্ষায় মাঠভরে উঠবে সবুজে আর পুকুর কানায় কানায়।

রাতে যখন দুধের গাড়িতে চাপলেন সারাদিন মুড়ি-চানাচুরে পেটে অম্বল ঘাই মারছে। গলা বুকে আগুন জ্বলন নামছে উঠছে। গাড়িতে পচা দুধের গন্ধে প্রথমে বমি ঠেলে এলেও, মাস্ক কিছুটা ঠেকালো। কিছুক্ষণ চলার পর সয়ে গেল।

গ্রামে ঢোকার মুখে শক্ত করে বাঁশ বাঁধা। সেখানে পাহারায় বসে উঠতি কিছু যুবকের দল। তাদের অনেকের মুখই অচেনা। তার প্রবাসকালে ওরা বড়ো হয়ে উঠেছে। পার্টির দু'একজন নেতা ওদের তদারকিতে ব্যস্ত। কোরানটিন এলাকা। মেন রাস্তা থেকে বাঁদিকে ইট বাঁধানো শাখাপথ সোজা ইসকুলে গিয়ে ঢুকেছে। হোমড়াচোমড়া গোছের নেতা আর উঠতি যুবকেরা ঠিক করে দিল তোমাদের কোরানটিনে থাকতে হবে চোদ্দ, পনেরোদিন। তোমরা পরিযায়ী।

মন খারাপ হয়ে গেল। বাড়ির এত কাছে এসেও নিজের বলে সেখানেও কিছু নেই। পকেট এখন বেশ মোটা, যতদিন আছে ওকে নিজের বলে মনে হবে বাড়ির লোকেদের।

ব্যবস্থা পাকা। ইসকুলঘরের বড়ো জানালা খোলা। হাওয়া খেলছে অবাধে। উঁচু নীচু বেঞ্চি জুড়ে শোয়ার জ্যায়গা। তাতে খড়বিছিয়ে গদি। দোতলা বিল্লিংয়ের নীচেরতলায় বেশ আরাম। আর পাঁচ-সাতদিন ধরে কঠোর জার্নি করে এতো অসীম সুখের আয়োজন। দুপুরে মুসুরডাল, ভাত, সয়াবিন তরকারি আর

ডিমসিদ্ধ। রাতে নাকি মাংস হবে আজ। বিকালে সবার বাড়ি থেকে লোক এসেছিল। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে হাত নাড়ল। গেটের বাইরে ভগার কোনও হাসিমুখ নেই, হাত নাড়ারও। অর্থও রোগের ভয় পেয়েছে। পাশেরবাড়ির অশোক এসেছিল। বাদলের বন্ধু। অমরের ছেলে। সে কেরালা ফেরত। এখানে আছে।

--"সুবল, বাদল জানে"? চিৎকার করেন যেন অশোক শুনতে পায়।

--"ওরা দু'জনেই বাড়িতে আছে কাকা, ছোটো বাচ্চা আছে। কাকিমা আসতে চাইছিল, ওরা আটকালো। বাবার করোনা হয়েছে কিনা, আগে টেস্ট হোগ"।

টেস্ট কেন? তার তো কোনও সমস্যা নেই।

অশোক বাবার জন্য আনা মুড়ি, বিস্কুট গেটের বাইরে রেখে গেল। ভগার এখন আরও নিঃসঙ্গ লাগে। আমার বাড়ি, আমার ছেলেমেয়ে, পরিবার। তাহলে কাদের জন্য দেশ-গাঁ, ভিটে ছেড়ে এতকাল আবার একটা শুনশান জ্যায়গার জন্য মন উতলা হয়। স্থান বদল করে একটা ঘুপচি মতো কোনা খুঁজে নেন, নিজের জন্য।

ঘুপচি কোনায় আড় হয়ে শুয়ে চোখের আগল খুলে যায়। সেবার রোগশয্যায় মাকে ছেড়ে কেরালা যাবার সময়, মা'র প্রায় শেষ অবস্থা। বিছানায় মিশে যাওয়া মায়ের করুণ আর্তি, পাশে থাকার আকুতি জীবন্ত হয়ে জ্বলজ্বল করে মনের নিভৃতে। থাকতে পারেননি। টাকার প্রয়োজন পরিবারের চাপ। সাতদিনের মধ্যেই মা....

ও কাকা আর কী নেবে? দোকানবন্ধ করবো। খেতে যাব। নিতাই ঠ্যালা দেয়। বাজারে পেরেক কিনতে এসে চায়ের দোকানে বসে অতীতে হারিয়েছিলেন। ধড়ফড় করে ওঠেন, উঠোনে মেলা কাজ পড়ে আছে। এবেলাই শেষ করতে হবে। কারোর মুখের দিকে তাকাবেন না। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোতেই হবে। দুর্বল হওয়ার কোনও চান্সই নেই।

ভরা সন্ধ্যায় একটু তন্দ্রা মতন এসেছিল। সারাদিনের খাটুনিতে পোক্ত মাচা রেডি। উঠোনের একপাশে দুটো সুপুরি গাছে ঠেস দিয়ে আড়কাত হয়ে দাঁড়িয়ে নির্মম সকালের অপেক্ষায়।

রাত গভীর হলে প্রতিমা খেতে ডাকল। বার কয়েক ধাক্কাও দিল। ওঠার ইচ্ছাই নেই। শেষ খাওয়াতে আর দেওয়ালের দিকে মুখ করে পড়ে রইলেন চিরনিদ্রার মহড়ায়।

রাত ফিকে হলে উঠে পড়লেন। অনেকবারই ঘুম ভেঙেছে, ভুসো অন্ধকার দেখে ওঠেননি। এখন বাইরে দেখে আন্দাজ হয়, সময় আর বিশেষ নেই। এক মায়াবি আলো ফুটছে চরাচরে। হাতে হাতে গুছিয়ে নেন দু'একটা প্রয়োজনীয় জিনিস। লুঙ্গি পায়ের গোড়ালি ঢেকে কষে গিঁট মারেন। দাওয়া ছেড়ে ধাপে নেমে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগোতেই পিছন থেকে টান। তক্তপোশের পেরেকে আটকেছে ভেবে অবলীলায় টান মারেন। ছিঁড়লে ছিঁড়ুক। খামচানো লুঙ্গি ধরে টুক করে সামনে খসে পড়ে চার বছরের অনল। দু'হাঁটু জড়িয়ে আধফুটন্ত স্বরে মুখোমুখি হয়। ঠিক যেন ছোট্ট বাদল। ছেলেবেলায় যেমন বাপ নেওটা ছিল।

--"ও দাদু আঁকে ক্যাতবারি দেব্যা না? তুমি তো বলেছিলে"। সত্যি তো, কোরানটিন থেকে ফিরলে সবার মুখ ছিল গোমড়া। সে যেন অচ্ছুৎ। কোনও জিনিস চাইলে ছুড়ে দিচ্ছিল সবাই। খাবার, শোবার ব্যাবস্থা দাওয়ার এককোনায়। ভাতের থালা আসছিল দূর থেকে ঠেলে। প্রতিমা দু'একটা গা'ঠ্যালা মারা কথা বলছিল, বাকিরা তাও নয়। একমাত্র এই দাদুভাই বিকেলে মায়ের শক্ত হাত ছাড়িয়ে ছুটে এসে দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে আদর-আবদার, খেলনা, কেটবারি।

দু'হাতে আঁজলা ভরে টেনে নেন ছোট্ট বাদলের কচি মুখখানা। সকালের মায়াবি আলোর ছটা আর কচি দু'হাতের বেষ্টনে কক্ষচ্যুত হয়ে পড়েন। এখন রাতচরা পাখিরা বাসায় ফিরছে ভালোবাসার টানে। ঝিঁঝিঁর কলতান থেমেছে, এবার ওরা নিশ্চিন্তে ঘুমোবে ওদের ভালো বাসায়। নতুন সূর্য গা ঝাড়া দিয়ে পূব আকাশ আলো করে ওঠে।

সৌদামিনীর সুদ

তনিমা সাহা

ধনিয়াপুরের কাঁচা রাস্তাটা পেরোতে রাত হয়ে গেল অনেক। মুদিপাড়ার বাবুল দত্ত টিমটিমে টর্চের আলোয় পথ দেখতে দেখতে তাড়াতাড়ি পা চালায়। পশ্চিম আকাশে তখন মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলক দেখা যাচ্ছে।

বাবুল মনে মনে বলে, 'আজ ফিরতে একটু বেশিই দেরি হয়ে গেল। এখন তো আকাশটাও বেগড়বাই করছে! ধ্যাৎ! কী যে হয় না আমার মাঝেমধ্যে!'

পা তাড়াতাড়ি চালাতে গিয়েও বাবুল বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। একটা অদ্ভুত হিসহিসে শব্দ অনেকক্ষণ থেকে তার কানে আসছে। নাহ! শব্দটা সাপ-খোপের নয়। কারণ, এই এলাকায় সাপের সেই ভাবে উপদ্রব নেই। তবুও শব্দটা বাবুলের

মনে একটা চাপা আতঙ্কের সৃষ্টি করে। শব্দটা বাবুলের খুব চেনা চেনা লাগে। বহু পুরোনো স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কিছু বছর আগে...

--দ্যাখ, তুই বেশি কথা বলিস না বলে দিলাম।

--কেন বললে কী করবি?

--দেখবি কী করব? দেখ তবে!

--তুই কী দেখাবি রে! অন্যের ক্ষেতে চুরি করতে ঢুকে আবার বড়ো বড়ো কথা।

'আরে রমেন কাকা করো কী? চলো বাড়ি চলো'--কথাটা বলে পাশে দাঁড়ানো এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক বৃদ্ধ রমেনকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে যায়। বিধবা সৌদামিনী আর বৃদ্ধ রমেনের এই জমি নিয়ে ঝগড়া অনেকদিনের। রমেনের আবার সৌদামিনীর ওই সাত ছটাক জমির ওপর লোভ ছিল। রমেনের বাবা সৌদামিনীর বাবাকে জমির ওই টুকরোটা ধার দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য সৌদামিনীর বাবা ধার শোধ করে জমিটি কিনে নেন। যদিও জমির ধার দেওয়া এবং সেই ধার শোধের কোনও কাগজ দুই পরিবারের কারোর কাছেই নেই। আর এরই মাঝে জমিটা সৌদামিনীর নামে কেনা হয়। এখানেই রমেনের আপত্তি! কারণ, রমেনের মনে হত ওই কয়েক ছটাক জমির জন্য গরিব সৌদামিনীর পরিবার রমেনের পরিবারের সমান হয়ে গেছে। আর তখন থেকেই রমেনের সৌদামিনীর প্রতি অসম্ভব দ্বেষ। রমেনের ছেলে বৌমা মারা গেছে বছর দুয়েক হল। বাবুল রমেনের নাতি। রমেন কেন সৌদামিনীর সাথে এভাবে ঝগড়া করে তা দশ বছরের বাবুল বোঝে না। সে তার দাদুকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা দাদু..তুমি সৌদামিনী জ্যেঠিমার সাথে এত কথা কাটাকাটি কেন করো?

রমেন খানিক গম্ভীর হয়ে বলে, 'ও সুদ আসলের হিসেব তুই বুঝবি না।'

বাবুল আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করে না। দাদুর রাগী স্বভাবের সাথে এ'কয়বছরে সে ভালোভাবেই পরিচিত হয়েছে। ঘটনার কদিন পরে একদিন মাঝরাতে একটা অদ্ভুত হিসহিসে আওয়াজে বাবুলের ঘুম ভেঙে যায়। চোখ কচলে বিছানায় বসে সে দেখে জানলার ওপাড়ে একটা ছায়া দেখা যাচ্ছে। একটু সন্দেহ হওয়ায় বাবুল জানলার কাছে এসে যা দেখতে পায়, তারপর

আতঙ্কে তার শিরদাঁড়া ঠান্ডা হতে যায়। বাবুল দেখতে পায় রমেন একটা ভারী চটের বস্তা ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর বস্তাটা থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে কিছু একটা গড়িয়ে পড়ছে। রাতের ওই কালো আঁধারেও বাবুলের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বস্তা থেকে চুঁইয়ে পড়া তরলটা আসলে রক্ত। ওই দৃশ্য দেখে বাবুলের হাত-পা কাঁপতে থাকে। পরেরদিন থেকে সৌদামিনী জ্যেঠিমাকে গাঁয়ে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে রমেন প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ে ও মারা যায়। মারা যাওয়ার কদিন আগে রমেনের মাথাটা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল।

সারাক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতো আর বিড়বিড় করে বলত, 'সবে তো আসল, সুদ যে এখনও বাকি!'

বাবুল সেদিন রমেনের কথার মানে বুঝতে পারে নি। বড়ো হওয়ার সাথে সাথে বাবুল সৌদামিনীর কথা ভুলে যায়। আজ এত বছর পর পুরোনো সেই স্মৃতি যেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বাবুলের মনে পড়ছে। আবার সেই হিসহিসে শব্দটা বাবুলের কানে আসে। চারদিক তখন শব্দহীন। পৃথিবী যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। নিঝুম রাত তখন একনাগাড়ে ডেকে চলেছে।

ঠিক এমন সময় কেউ খুব কাছে দাঁড়িয়ে বাবুলের কানে কানে বলে, 'সবে তো আসল সুদ যে এখনও বাকি।'

কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃত Sanitary Inspector কোর্সে ভর্তি চলছে

যোগ্যতা : H.S & Computer Basic

IIHT

226 B.B.Ganguly Street Bowbazar, Kol-70012
9836396734, 7003224427
Website : www.iiht.in

কলকাতার গর্ব—

দ্য আরবিআই মিউজিয়ামে পা রাখলেই হারিয়ে যাবেন টাকার জগতে

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তৈরি ঐতিহ্য, জ্ঞান আর শিক্ষার কেন্দ্র হল 'দ্য আরবিআই মিউজিয়াম'। আগে শুধুমাত্র মুম্বইতে ছিল আরবিআই মনিটারি মিউজিয়াম। ২০১৯ সালের ১১ মার্চ কলকাতায় দ্বিতীয় আরবিআই মিউজিয়ামের পথচলা শুরু হয়। এই মিউজিয়ামে আসলে জানা যাবে কীভাবে টাকার উৎপত্তি, কোন পদ্ধতিতে অর্থনীতিতে টাকা খাটে, মুদ্রার বিনিময়, টাকার বিবর্তন, কীভাবে ও কেন সংকটের সময়ে সোনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

কলকাতায় এই বাড়ির এক পুরোনো ইতিহাস রয়েছে। 'দ্য আরবিআই মিউজিয়াম'-এর এই আইকনিক লাল ও সাদা বিল্ডিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মার্টিন অ্যান্ড কোং। এর মালিক ছিলেন স্যার রাজেন মুখার্জি ও স্যার থমাস অ্যাকুইন মার্টিন। ১৯৩৫ সালে স্যার ওসবারন স্মিথের গর্ভনরশিপে এই বাড়িতে তৈরি হয় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। আগে এই বাড়ি ছিল অ্যালায়েন্স ব্যাঙ্ক অফ সিমলার। ১৯৩৫ সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাড়িটি লিজ নেয়। ১৯৪৩ সালে যখন অ্যালায়েন্স ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দেউলিয়া হিসাবে ঘোষণা হয় তখন আরবিআই এই সম্পত্তির লিজ নেয়। ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি আরবিআই-এর নতুন বিল্ডিং শুরু হয় আর পুরোনো অফিসে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নানা অফিসের কাজ শুরু হয়।

সদর দিয়ে ঢুকেই অভ্যর্থনা কক্ষ। ঘরের এক দেওয়ালে কারেন্সি নোটের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুরো জীবনচক্র ছবির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। অন্য দেওয়াল সাজানো বাতিল নোটের মণ্ড দিয়ে। বাতিল নোট দিয়ে তৈরি নানা উপহার সামগ্রীও ওই ঘরে শোভা পাচ্ছে। সেসব অবশ্য বিক্রির জন্য। দর্শকরা সেখান থেকে পছন্দমতো জিনিস কিনে প্রিয়জনকে উপহার দিতে পারেন। ঘরের বিশাল থামের গায়ে রয়েছে পুরোনো দশ পয়সার মুদ্রা দিয়ে সাজানো মানুষের ডিএনএ-র আকৃতির নকশা। এই মিউজিয়াম নিঃসন্দেহে কলকাতার গর্ব। যা প্রতিটি মানুষের একবার ঘুরে দেখা দরকার।

অভ্যর্থনা ঘরের একদিকে এক বিশাল আকৃতির ১ টাকার কয়েনের ভেতর দিয়ে ঢুকতে হয় মূল প্রদর্শন কক্ষে। সেখানে রয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্পর্কে তথ্যচিত্র। গোটা ঘর জুড়ে সাজানো নানা তথ্য সম্বলিত পোস্টার ও ছবির দিকে চোখ যেতে বাধ্য। এই সব ছবি ও পোস্টার থেকে মিলবে নানা তথ্য। একসময় আমাদের সমাজে টাকার বদলে শস্যকণাই ছিল প্রথম বিনিময় মাধ্যম। পৃথিবীর সব দেশে যখন বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে মুদ্রা ব্যবস্থার সূচনা হয়, ভারতীয় উপমহাদেশেও প্রায় একই সময়ে মুদ্রা ব্যবস্থা চালু হয়। এখানে মিলবে পৃথিবীর নানা দেশের নানা সময়ের মুদ্রা ও টাকার সচিত্র ইতিহাস। দীর্ঘকাল পর্যন্ত টাকার মান নির্ধারিত হত সোনার দামের নিরিখে। দেশে যখন কারেন্সি নোট ছাপা হত, তখন সেই মূল্যমানের সমপরিমাণ সোনা জমা রাখা হত ভল্টে। মডেলের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে ওই সময়ের সেই সব ভল্টের ছবি। এক সময় ভারত সরকারের নানা বন্ড পিডি ও প্রেস থেকে ছাপা হত। হাতে চালানো সেই ছাপাখানা চালু অবস্থায় এখানে রয়েছে। দেখতে পাবেন ভিনটেজ প্রেস। তার সঙ্গে পাওয়া যাবে এই ভিনটেজ প্রেস সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ও আলোকচিত্র। এই মিউজিয়াম দেখতে আসার প্রমাণ হিসাবে দর্শকদের নাম ছাপানো শংসাপত্রও উপরি পাওনা হিসেবে পাওয়া যেতে পারে এখান থেকে।

জাদুঘরের দ্বিতীয় তলায় রয়েছে শিশু-কিশোরদের খেলার জায়গা। বায়োস্কোপ, সাপ লুডো, ক্যারামের মতো জনপ্রিয় সব খেলাকে সহজ সরলভাবে সাজানো হয়েছে অর্থনীতির নানা প্রকল্পের আঙ্গিকে। শিশু ও কিশোররা যাতে বুঝতে পারে ও খেলাচ্ছলে ব্যবসা, ব্যাঙ্কিং নানা দিক সম্পর্কে সচেতন হতে পারে সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। এই ঘরে গবেষকদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে একটা ডিজিটাল আর্কাইভ, যেখানে বসে কাজের জন্য দরকারি সব তথ্য মিলবে। এই মিউজিয়ামে ঢোকার জন্য কোনো টিকিট লাগে না। আগে থেকে আসার জন্য বুকও করা যায়। তবে মিউজিয়ামে ঢোকার জন্য বৈধ পরিচয়পত্র লাগে। মিউজিয়ামের ফটো তোলা যাবে তবে ভিডিও রেকর্ডিং নিষিদ্ধ।

কোন ঠিকানায় আসবেন

আরবিআই মিউজিয়ামের ঠিকানা- ৮, কাউন্সিল হাউস, বিবাদি বাগ, কলকাতা-৭০০০০১। সেন্ট জনস চার্চের উল্টোদিকে।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে এই মিউজিয়াম। হাওড়া বা শিয়ালদহ থেকে বাসে করে বিবাদি বাগ স্টপেজে নামতে হবে। সেখান থেকে মাত্র ৫ মিনিটের দূরত্ব।

খোলা থাকার সময়

মঙ্গল থেকে রবিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। ছুটির দিন বন্ধ থাকে (২৬ জানুয়ারি, ১৫ আগস্ট, ২ অক্টোবর)

সেরা আকর্ষণ

টাকার জীবন বৃত্তান্ত, প্রচুর মুদ্রার ইতিহাস, পুরোনো ভল্টের ছবি। রয়েছে বাচ্চাদের খেলার জায়গা।

যা যা কেনা যাবে

বাতিল নোটের উপহার সামগ্রী, দর্শকের নামে ছাপা শংসাপত্র।

আরবিআই মিউজিয়ামের মূল উদ্দেশ্য

এই মিউজিয়ামের মূল উদ্দেশ্য সাধারণ লোককে দেশের আর্থিক ও ব্যাঙ্কিং বিষয়ে সচেতন করা। যা সবার জানা দরকার।

জরুরি তথ্য

টাকার মিউজিয়াম দেখে বেরোনোর পর যেতে পারেন সোভেনিয়র শপ-এ। যেখানে পাবেন আর্থিক সম্পদ ও ব্যবসা সংক্রান্ত নানা বইপত্তর ও পুস্তিকা। এই দোকানে বিক্রি হয় টাকা ও মুদ্রার নানা মডেল।

বিশেষ নিবন্ধ—

বলিউডের ছয় তারকার নামে মন্দির

অভিনয়ের দুনিয়ায় তারকাদের ফ্যান ও ফলোয়ারদের সংখ্যা প্রচুর। বলিউডের তারকাদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছেন যাঁদের নামে মন্দিরও রয়েছে। সেখানে ভক্তরা রোজ তাঁদের পুজো দেন। তেমনই ছয় তারকার কথা এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হল।

সোনু সুদ : এই তালিকায় সবার আগে নাম আসে সোনু সুদের। বলিউডের এই অভিনেতা করোনার সময় অসহায়, আর্তদের পাশে কীভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, কীভাবে অন্যের সমস্যায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তা গোটা দেশ দেখেছে। তাঁকে বলা হয় গরিবদের মসীহা। তেলেঙ্গানার টান্ডা গ্রামে তাঁর নামে এক মনিদ্র প্রতিষ্ঠা করা হযেছে। সেখানে তাঁর মূর্তি রয়েছে।

নাগার্জুন : দক্ষিণের এই তারকার ভক্ত সংখ্যাও কিছু কম নয়। শুধু দক্ষিণেই নয় নাগার্জুনের ভক্তরা ছড়িয়ে রয়েছেন দেশের নানা প্রান্তে। অনেক বছর আগে দক্ষিণে তাঁর নামে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। তন্ন মাচার্য নামের মন্দিরটি নাগার্জুনের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মন্দির তৈরি করতে ২২ বছর সময় লাগে।

রজনীকান্ত : রজনীকান্ত হলেন দক্ষিণের 'থালাইভা'। তাঁর জনপ্রিয়তা বরাবরই সবার ওপরে। বয়সটা তাঁর কাছে একটা সংখ্যা মাত্র। রজনীকান্তকে তাঁর ভক্তরা ঈশ্বর বলে মনে করেন। রজীনকান্তের নামে কর্ণাটকের কোলার জেলায় কোটিলিঙ্গেশ্বর মন্দিরে সহস্র লিঙ্গম তৈরি হয়েছে।

অমিতাভ বচ্চন : খোদ কলকাতার বুকে অমিতাভ বচ্চনের মূর্তি ও মন্দির রয়েছে। এই মন্দিরের নাম বচ্চন ধাম। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে রয়েছে এই বচ্চন ধাম। এই শহরের বিগ বি ভক্তরা এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেই রয়েছে তাঁর মূর্তি। রোজ সকাল ও বিকেলে তাঁর পুজো হয় ও অমিতাভ নাম দিয়ে মন্ত্র পড়া হয়।

মমতা কুলকার্নি : বলিউডের এই অভিনেত্রী একসময় তুমুল জনপ্রিয় ছিলেন। যদিও পরে তিনি আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন বলে চর্চা শোনা যায়। তাঁর স্বামী চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে খবরও সামনে আসে। তবে মমতার অভিনয় ও সৌন্দর্যের পূজারিরা অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোরে তাঁর নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে রোজ তাঁর পুজো হয়।

হানসিকা মোতওয়ান : শাহরুখ খান, রানি ও কাজলের 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' ছবির ছোট্ট মিষ্টি অঞ্জলিকে নিশ্চয় ভুলে যাননি? ছোট্ট সেই মেয়েটি এখন পূর্ণ যুবতী। তাঁরও বেশ বড় ফ্যানবেস রয়েছে। মাদুরাইতে একটি মন্দির রয়েছে সেখানে হানসিকার প্রতিমা স্থাপন করা হয়। সেখানেই তাঁর রোজ পুজো হয়।

শতবর্ষে স্মরণ—

উত্তমকুমারের বদলে কালী ব্যানার্জিকে ছবিতে নিয়েছিলেন মৃণাল সেন

ড. শঙ্কর ঘোষ

বাংলা ছবির ক্ষেত্রে একইসঙ্গে উচ্চারিত হয় তিনটি নাম- সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেন। একেবারে অন্য ধারার ছবি নির্মাতা তাঁরা। সেই মৃণাল সেনের জন্ম শতবর্ষ চলছে। ১৯২৩ সালের ১৪ মে তাঁর জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুরে। বাবা দীনেশ সেন ও মা সরযূবালা সেন। পড়াশোনার জন্য মৃণাল সেন কলকাতায় চলে আসার পর চলচ্চিত্র ও রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। বামপন্থী আন্দোলনেও যুক্ত হন। নিজেকে মার্কসবাদী বলতে কুণ্ঠিত হতেন না। ছবির জগতে তাঁর প্রথম দুটি ছবি 'রাতভোর' এবং 'নীল আকাশের নীচে'র কথা তিনি তেমনভাবে বলতেনই না। মৃণাল সেন পরিচালিত একমাত্র 'রাতভোর' ছবিতেই উত্তম কুমার অভিনয় করেছিলেন। বিপরীতে ছিলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। ছবি চলেনি। উত্তমের প্রতি মোহ ততদিনে কেটেও গিয়েছে। তাই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত 'নীল আকাশের নীচে' ছবিতে চিনা ফেরিওয়ালার চরিত্রটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায় উত্তম কুমারকে দিয়ে করাতে চাইলেও মৃণালবাবু সম্মত হলেন না। সেই চরিত্রে এলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী মৃণাল সেন 'নীল আকাশের নীচে' ছবিতে গান পর্যন্ত ব্যবহার করতে চাননি। তবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জারিজুরিতে দুটি গান (ও নদীরে একটি কথাই শুধাই শুধু তোমারে, নীল আকাশের নীচে ওই পৃথিবী) ব্যবহার করা হয়েছিল। দুটি গানই সুপারহিট। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিল ছবিটিও। 'বাইশে শ্রাবণ' ছবিতে মাধুরী নামে যিনি ছবির জগতে এসেছিলেন সেই মাধুরীর নতুন নামকরণ করা হল মাধবী। 'পুনশ্চ' ছবির ক্ষেত্রে মৃণাল সেন নায়িকার সন্ধানে বেরিয়ে যে মহিলার সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁকে পছন্দ না হলেও মহিলার স্বামীকে তিনি নিয়ে এলেন ছবির জগতে। তিনি এন বিশ্বনাথন। এইভাবে একের পর এক ছবি তিনি করলেন। তবে তেমন সাড়া জাগানো কিছুনয়। ১৯৬৫ সালে এল 'আকাশ কুসুম'। সৌমিত্র, অপর্ণা ও শুভেন্দু অভিনীত এই ছবি নিয়ে সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেনের মধ্যে চিঠির চাপানউতোর একসময় পত্রিকার পাঠকরা খুব এনজয় করেছিলেন। হিন্দিতে প্রথম ছবি 'ভুবন সোম' মোড় ঘুরিয়ে দিল তাঁর জীবনের। উৎপল দত্ত, সুহাসিনী মূলে অভিনীত ছবিটি রাষ্ট্রপতির শ্রেষ্ঠ ছবির সম্মান পেল। 'মৃগয়া' ছবির ক্ষেত্রেও তাই। এই ছবিতে মিঠুন ও মমতা শঙ্কর একসঙ্গে প্রথম অভিনয় করলেন। 'ইন্টারভিউ' ছবিটি দিয়ে রঞ্জিত মল্লিককে সিনেমা জগতে প্রথম নিয়ে এলেন। কলকাতার ট্রিলজি বলে খ্যাত তাঁর তিনটি ছবি ইন্টারভিউ, কলকাতা ৭১, পদাতিক। মৃণাল সেন জীবনে ২৮টি ছবি করেছেন। তাঁর মধ্যে কুড়িটি বাংলা, ছটি হিন্দি, একটি ওড়িয়া, একটি তেলেগু, ১৩ পর্বের টেলি সিরিয়াল তিনি করেছেন। তার তিনি নাম রেখেছিলেন 'কাভি দূর কাভি পাস'। একটি টেলিফিল্মও তৈরি করেছিলেন। নাম ছিল 'তাসবির আপনি আপনি'। তাঁর অন্য হিন্দি ছবিগুলো হল খণ্ডহার, জেনেসিস, একদিন আচানক, এক অধুরি কাহানি। মৃণাল সেনের অন্যান্য বাংলা ছবির মধ্যে রয়েছে একদিন প্রতিদিন, পরশুরাম, আকালের সন্ধানে, চলচ্চিত্র, খারিজ, মহা পৃথিবী, অন্তরীণ, আমার ভুবন। তিনি রাজ্যসভার মেম্বারও হয়েছিলেন। পদ্মভূষণ সম্মানেও তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে। দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন। দেশ-বিদেশে তাঁর ছবি পুরস্কৃত। তিনি সম্মানিত। সেই মানুষটি আমাদের ছেড়ে চলে যান ২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর। জন্ম শতবর্ষে সেই শিল্পীকে জানাই আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

শতবর্ষ স্মরণে—

সুচিত্রাদি ছিলেন কোমল হৃদয়ের দৃপ্ত মহিলা

রবীন্দ্রসঙ্গীতের কিংবদন্তী গায়িকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য। তাঁর সুরেলা কণ্ঠের জাদুতে বিভোর হয়ে থাকেন শ্রোতারা। এই বছর তাঁর জন্মশতবর্ষ। ১৯২৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর জন্ম হয় সুচিত্রা মিত্রের। তাঁকে স্মরণ করেছেন সঙ্গতকার তবলাশিল্পী **বিপ্লব মণ্ডল**।

সারাজীবন রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে বাঙালির উজাড় করা ভালোবাসা পান। জীবদ্দশায় হয়ে উঠেছিলেন কিংবদন্তি। আজ শতবর্ষেও তিনি সমানভাবে উজ্জ্বল। ছয়ের দশকে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করান কম্পোজার রামগোপাল ভট্টাচার্য। তখনই তিনি খ্যাতির মধ্য গগনে। প্রথম দর্শনে তাঁর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলাম। দেখে বেশ ভয় লাগত। পরে যখন মিশেছি তখন বুঝতে পারি তাঁর বাইরেটা কঠোর কিন্তু ভেতরটা কোমল। অন্য সকলের মতো আমিও তাঁকে দিদি বলে ডাকতাম ঠিকই কিন্তু তিনি ছিলেন আমার মায়ের বয়সি। সুচিত্রাদি বলতেন, 'আমার দুই ছেলে কুণাল আর বিপ্লব'। তাঁর বাড়িতে আমার অবাধ যাতায়াত ছিল। যখন খুশি কাজে-অকাজে যেতাম। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে তাঁর কাছে গেলে নিজের হাতে রেঁধে ভালো-মন্দ খাওয়াতেন। ধীরে ধীরে সুচিত্রাদির সঙ্গে আমার এক ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি হয়। আমার প্রয়াত স্ত্রী রমা মণ্ডল তাঁর অন্যতম প্রিয় ছাত্রী ছিলেন। সুচিত্রাদি ও সুমিত্রাদি আমাদের বিয়ের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

সুচিত্রাদির গানের রেকর্ডিয়ে যেমন বাজিয়েছি, তেমনই তাঁর সঙ্গে দেশে-বিদেশে নানা অনুষ্ঠানে তবলায় সঙ্গত করেছি। 'তাসের দেশ' নিয়ে তাঁর মার্কিন ও কানাডা সফরে সঙ্গী ছিলাম। সেখানে দিদিকে অন্যভাবে দেখি। দলের নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি সবসময় নজর রাখতেন বিদেশে যেন দেশের সম্মান বজায় থাকে। আবার অনুষ্ঠানের সময় অন্য রূপ, শিশুর মতো সরল। তাঁর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে কখনও বকুনি খায়নি কিন্তু দেরি করার জন্য মৃদু ভর্ৎসনা খেয়েছি। সুচিত্রাদি কখনও খাতা দেখে গান করতেন না। সবসময় সঙ্গীদের উৎসাহ দিতেন। তাঁর পরিচালনায় শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, নটীর পূজা, শাপমোচন, তাসের দেশ অন্য মাত্রা পায়। গানের কথা বুঝে সুর অনুযায়ী ফুটিয়ে তুলতেন গানের নাটকীয়তা। অনেক সময় গাইতে গাইতে তাঁকে কাঁদতে দেখে, অবাক হয়ে তার কারণ জানতে চেয়েছি। তখন বলতেন, তোর বয়স কম, বুঝবি না। পরে উপলব্ধি করি রবীন্দ্রনাথের গান শুধু শোনার বা গাওয়ার জন্য নয়, গভীরতা অনুভব করতে হয়। 'কৃষ্ণকলি' বা 'যদি তোর ডাক শুনে' সুচিত্রা কণ্ঠের 'সিগনেচার টোন' হলেও আরও অনেক গান রয়েছে যা রবীন্দ্রনাথের হয়েও অনেকটাই যেন সুচিত্রা মিত্রের। পাশাপাশি গণনাট্যের গানেও তিনি ছিলেন দক্ষ। সলিল চৌধুরী কৃষ্ণকলির ভাবসম্প্রসারণ করে তাঁর জন্য লেখেন, 'আমি সেই মেয়ে'। এই গান তাঁর গলায় অন্য মাত্রা পায়। এই গান তৈরির সময় তিনি নেচে নেচে গাইতেন। রবীন্দ্রনাথের গানকে রাগ-রাগিনীর বন্দিশ করে যে ভাবনা ভেবেছিলেন আমজাদ আলি খান ও সুচিত্রা মিত্র, তা পাওয়া যায় 'ট্রিবিউট টু টেগোর' রেকর্ডে। এই গানের সঙ্গেও আমি তবলা বাজাই। সুচিত্রাদির রাগ-রাগিণীর প্রয়োগ দেখে অবাক হয়েছিলেন স্বয়ং আমজাদ আলি খান।

সুচিত্রাদি যেমন ছিলেন অসাধারণ গায়িকা, তেমনি ছিলেন যত্নবান শিক্ষিকা। আমার স্ত্রী রমাকে যখন গান শেখাতেন, রমার খাতার পাশে দেখতাম লেখা রয়েছে গানের কোন কথায় শ্বাস নিতে হবে আর কোথায় ছাড়তে হবে। কীভাবে গানের বাণী বুঝে গান করতে হবে। সবসময় নোটেশন অনুযায়ী গান গাইতে পছন্দ করতেন। আর সেভাবেই শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দিতেন। শুধু তাঁর গায়কি নয়, সঠিক তাল, ছন্দ ব্যবহার করে তিনি গানকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিতেন। সবার মাজে ছড়িয়ে দিতেন। ছাত্রদের গান শেখানোর জন্য প্রতিষ্ঠা করেন 'রবিতীর্থ'। গানের পাশাপাশি ছিলেন দক্ষ অভিনেত্রীও। ছোটোবেলায় 'মায়ার খেলা'য় শান্তা বা চিরকুমার সভা'য় নৃপবালার ভূমিকায় যেমন অভিনয় করেন, তেমনি কলকাতায় ফিরে আইপিটিএ-র অনেক নাটকে অভিনয় করেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় উমাপ্রসাদ মৈত্রর পরিচালনায় তৈরি 'জয় বাংলা' ছবিতে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের বিখ্যাত জননেত্রী বেগম সুফিয়া কামালের চরিত্রে অভিনয় করেন। বিষ্ণু পালচৌধুরীর 'আমার নাম বকুল' ধারাবাহিকের একটি পর্বে অভিনয় করেন। তাঁর বড়পর্দায় শেষ কাজ ঋতুপর্ণ ঘোষ পরিচালিত 'দহন' ছবি।

সৃজনশীল কর্মযোগীর সঙ্গে সুচিত্রাদি ছিলেন প্রতিবাদী চরিত্রের। কারো কাছে কখনও মাথা নীচু করেননি। তাঁর মধ্যে সবসময় পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাই তিনি শতবর্ষেও 'বিজয়িনী'। তাঁকে শতকোটি প্রণাম।

সংস্কৃতি—

গ্রাম ও শহরের সংস্কৃতির মেলবন্ধন চাই : আশিস কুমার গিরি

একদিকে লোকসঙ্গীতের গায়ক ও গবেষক আর অন্যদিকে, পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা আশিস কুমার গিরি। চাইছেন গ্রাম আর নাগরিক সংস্কৃতির সেতুবন্ধন হোক।

৪ দশক ধরে বাংলার লোকসংস্কৃতি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে চর্চা করে চলেছেন লোকসঙ্গীতের গায়ক, গবেষক, লেখক ও সরকারি আধিকারিক আশিস কুমার গিরি। মেদিনীপুরের দাঁতনের এই ভূমিপুত্র আজও আদ্যপান্ত গ্রামের মানুষ। গ্রামের মাটি ও জল গায়ে মেখে বেড়ে উঠেছেন। ফলে, স্বাভাবিকভাবে তাঁর মধ্যে একেবারে ছোটো থেকেই লোকগান-লোকনাট্যের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়। তাঁর কথায়, "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে 'লোকমাধ্যমে গণজ্ঞাপন' বিষয়ে গবেষণা করার সময় লোকসংস্কৃতির প্রতি আমার গভীর টান তৈরি হয়। দেশের বেশিরভাগ লোক গ্রামে থাকেন আর নানা জেলার বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির চলন আমাকে খুব আকর্ষণ করে। ধীরে ধীরে লোকসংস্কৃতি আমার জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে।"

লোকসংস্কৃতি গবেষক আশিসের অভিজ্ঞতায়, এই মুহূর্তে গ্রাম ও শহরের লোকদের লোকসংস্কৃতি চর্চায় এক অদ্ভুত বৈপরীত্য চোখে পড়ে। গ্রামের লোকেরা টিভি, ইন্টারনেট আর মোবাইলে আসক্ত হয়ে নিজেদের সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। আর শহরের মানুষ নাগরিক জীবন ও সিরিয়ালের একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয়ে নিজেদের শিকড় খুঁজতে চাইছেন। তাই নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে লোকসংস্কৃতির প্রতি নতুন করেই আগ্রহ তৈরি হচ্ছে। তাঁর মতে, এই বৈপরীত্য বিদেশেও দেখা যাচ্ছে। একেই বলে ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে।

নাগরিক লোকেদের গলায় কি লোকসঙ্গীত বিশুদ্ধতা হারাচ্ছে? এর উত্তরে এই লোকসঙ্গীত গায়ক জানান, সংশয়বাদীরা অনেকে এই অভিযোগ তুলছেন। কিন্তু তিনি মনে করেন, চেষ্টাটাই আসল, নতুন প্রজন্মের মধ্যে লোকসংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার হচ্ছে। লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল, যথার্থ শিক্ষকের অভাব। রবীন্দ্রভারতী ও বিশ্বভারতী সহ নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে ডিগ্রি ও মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হলেও লোকসঙ্গীত আলাদাভাবে পড়ানো হয় না। ফলে লোকসঙ্গীত শেখার সুযোগ কম। এটা গাওয়ার জন্য আলাদা গায়কী লাগে, তা রপ্ত করতে হয়। গান পরিবেশনের পাশাপাশি দরকার গান নিয়ে পড়াশোনা।

আশিস কুমার গিরি দীর্ঘদিন আকাশবাণীর প্রোগ্রাম অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছেন। নতুন নতুন অনুষ্ঠান করেছেন। ২০২২ সালের ৬ অক্টোবর কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তার দায়িত্ব পান। এখানে তাঁকে সাতটি জোনাল কালচারাল সেন্টারের দায়িত্ব সামলাতে হয়। পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের কাজ হল, অসম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, মণিপুর, সিকিম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ আর আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের লোকসংস্কৃতির প্রচার আর প্রসার।

আশিস গিরি দায়িত্ব নেওয়ার পর এখন ইজেডসিসি-তে খোলা হাওয়া বইছে। লোকসঙ্গীত শিল্পী, সংগঠন ও লোকসংস্কৃতিপ্রেমী যে কোনও লোক দরকারে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন। অধিকর্তা জানান, 'আমরা চাইছি গ্রাম ও শহরের লোকসংস্কৃতির মেলবন্ধন। গ্রামের প্রতিভাবান শিল্পীদের অনুষ্ঠানের সুযোগ দেওয়া হয়। শিল্পীদের জন্য থাকে কর্মশালা। সারা বছর ধরে এই কেন্দ্রের উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠান হয়।'

লোকসংস্কৃতি, লোকসঙ্গীত, লোকনাটক ও গ্রামীণ শিল্প নিয়ে আশিস কুমার গিরির ত্রিশটির বেশি বই আছে। তাঁর সংগ্রহে রয়েছে নানা স্বাদের ১৫০টির বেশি লোকগান। তাঁর রেকর্ড সংখ্যা ১৫-২০টি। আকাশবাণীতে কাজ করার সময় বেতারে নাটক প্রযোজনার জন্য ৪বার তিনি জাতীয় পুরস্কার পান। লোকসংস্কৃতির নানা ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করলেও তাঁর প্রাণের জায়গা লোকগান। গানের তালিম নেন লোকসঙ্গীত গায়ক দীনেন্দ্র চৌধুরীর কাছে। তাঁর গানের অনেক রেকর্ড রয়েছে। জেলা ও কলকাতায় হওয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গানে অংশ নিয়েছেন। সরকারি পদের গুরুদায়িত্ব সামলেও কীভাবে গানের জন্য সময় পান? সহাস্যে অধিকর্তা জানান, 'আমলা পদের বিশাল দায়িত্ব। কাজের ভিড়ে মাঝেমাঝে গায়ক সত্ত্বাকে খুব মিস করি। খোলা গলায় গান গাইতে পছন্দ করি। সরকারি পদে থেকে তা সবসময় সম্ভব হয় না।' লোকসংস্কৃতি নিয়ে চর্চা করার জন্য আশিস গিরির নিজস্ব সংগঠন রয়েছে 'লোক বিকাশ সংগঠন'। এই সংস্থার উদ্যোগে তৈরি হয়েছে লোকায়তনের সংগ্রহশালা। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত খোলা থাকে। লোকসংস্কৃতি গবেষক আশিস কুমার গিরি জানান, লোক বিকাশ সংসদের উদ্যোগে গোবরডাঙায় তৈরি হচ্ছে কালচারাল হাব।

পাড়ার জলসা এখন শুধুই হারানো স্মৃতি : তোচন ঘোষ

প্রায় ৫ দশক ধরে গানের জলসার ব্যবস্থাপনার কাজ করে চলেছেন জলসা সংগঠক তোচন ঘোষ। হেমন্ত-মান্না-রফি-কিশোর, আশা থেকে শুরু করে আজকের অরিজিৎ সবার সঙ্গেই কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।

পাড়ার জলসার অস্তিত্ব কি সত্যিই হারিয়ে গেল ?

তোচন ঘোষ : শীতের মরসুম, পুজোর সময় বা অন্য বিশেষ কোনো উপলক্ষে পাড়ায় পাড়ায় জলসার চল ছিল। সেখানে নামকরা সব গায়ক-গায়িকাদের পাশাপাশি অনেক নতুন শিল্পীও গাইতেন। এভাবে অনেকেই নতুন গায়ক-গায়িকা উঠে এসেছেন, পরে যাঁরা যথেষ্ট নামও করেছেন। এখন পাড়ার জলসা মানে শুধুই হারানো স্মৃতি। যার আর কোনো চাহিদা নেই।

তাহলে বলা যায় শ্রোতারা আর বাংলা গান শুনছেন না !

তোচন ঘোষ : ভারতের সব কিংবদন্তি গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে জলসা করেছি। তাঁদের সঙ্গে আজকের শিল্পীদের তুলনা করতে চাই না। অনেকে ভালো গান করেন। কিন্তু তাঁদের নিজেদের একটা বা দুটো গানের পর অন্য শিল্পীদের হিট গান গাইতে হয়। কারণ, তাঁদের নিজস্ব কোনো হিট গান নেই। ফলে, শ্রোতারা আগ্রহ দেখান না। আর চাহিদা না থাকায় উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসেন না। গত দশ বছরে বাংলায় সেভাবে কোনো হিট গান শোনা গেছে!

অরিজিৎ সিংকে তাহলে কী বলবেন ?

তোচন ঘোষ : এই সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও ব্যতিক্রমী গায়ক অরিজিৎ সিং। ওঁকে নিয়ে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠান করি। প্রায় ২০ হাজার আসন ছিল। সবটাই ভরে যায়। অরিজিৎ এত জনপ্রিয় গায়ক হলেও মাটির মানুষ। গ্রামের ছেলে বলে নিজের শিকড় ভোলেনি। ওঁর সঙ্গে কারোর তুলনা হয় না।

জলসার জগতে আপনার কত বছর হল ?

তোচন ঘোষ : প্রায় ৪৮ বছর।

কীভাবে জলসার জগতে আসেন ?

তোচন ঘোষ : গান-বাজনা ছিল আমার রক্তে। আমার নিজের পিসি ছিলেন উৎপলা সেন ও পিসেমশাই সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। মামা ছিলেন নজরুলগীতির রাজা ধীরেন বসু। একবার গায়ক ভূপেন হাজারিকা বলেছিলেন, 'তোচন নিজে গান গাইতে পারে না তাই জলসার আয়োজন করে'। না, এটা কোনো নিন্দে নয়। ভূপেনদা আমার থেকে বয়সে অনেক বড়ো ছিলেন, আমায় খুব স্নেহও করতেন। আমি ভূপেনদা ও উষাদিকে (উষা উত্থুপ) নিয়ে সবচেয়ে বেশি জলসা করেছি।

এটা কীভাবে পেশা হয়ে উঠল ?

তোচন ঘোষ : আমার বড়ো ভাইয়ের বন্ধু ছিলেন সাংবাদিক ও চিত্রপরিচালক অজয় বিশ্বাস। তিনি পরিচালনায় এসে 'প্রথম প্রেম' নামে একটি ছবি করেন। সেখানে অভিনয় করেন প্রখ্যাত খেলোয়াড় চুনী গোস্বামী। পরে তিনি মুম্বই চলে যান। সেই সব পরের কথা। ওই সময় অজয়দা 'উলটোরথ' ও 'জলসা' নামে দুটো সিনেমা পত্রিকায় সাংবাদিকতা করতেন। মুম্বইয়ের তারকাদের নিয়ে নানা ধরনের মুখরোচক খবর লিখতেন। যা খুব জনপ্রিয় হয়। অজয়দা অন্য কাজের পাশাপাশি ফাংশন আয়োজক হিসাবেও কাজ করতেন। উনিই আমাকে এই জগতে নিয়ে আসেন। তাঁর সহকারি হিসাবে কাজ শুরু করি। অজয়দার সহকারি হিসাবে অনেক কাজ করেছি যা খুব স্মরণীয়।

তেমন একটা ঘটনা বলুন...

তোচন ঘোষ : একবার কিশোরকুমারকে নিয়ে তিন নাইট অনুষ্ঠান হয়। প্রথমটা মেদিনীপুর, দ্বিতীয়টা বর্ধমানে ও তৃতীয়টা চন্দননগরে। মেদিনীপুরের অনুষ্ঠানে যেতে গিয়ে রাস্তায়

কিশোরকুমারের গলায় ধুলো ঢুকে গিয়ে গলা 'চোকড' হয়ে যায়। অনুষ্ঠানে গান গাইতে পারেননি। বাবার অনুরোধে ওই জলসায় গান করেন তাঁর ছেলে অমিতকুমার। পরদিন কিশোরকুমার সোজা চলে আসেন কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলে। পরেরদিন অজয়দা আর আমি কালীঘাটে পুজো দিয়ে ফুল-প্রসাদ তাঁর মাথায় ঠেকাতে গেলে কিশোরকুমার বলেন, 'আজকের দিনে এসব চলে না'। তাঁর কথায় বর্ধমানের অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়া হয়। কিশোরদা তাঁর বদলে হেমন্তদাকে (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়) দিয়ে গান গাওয়ানোর অনুরোধ করেন। আমরা দু'জনে হেমন্তদার বাড়ি গিয়ে তাঁকে রাজি করাই। হেমন্তদা বলেন, 'পারিশ্রমিক পেয়েছি, এবার পেশাদার গায়ক হিসাবে

গান গাইব'। হেমন্তদা অনুষ্ঠানে গান গাইতে এসে দেখেন নেচে নেচে অনুষ্ঠানে কিশোরকুমার গাইছেন। তখন হেমন্তদা বলেন, 'তাহলে আমাকে কেন টাকা খরচ করে গান গাওয়ানোর জন্য নিয়ে এলে'? কথাটা শুনতে পেয়ে কিশোরদা বলেন, 'হেমন্তদা না থাকলে আমি গাইব না'। চন্দননগরের অনুষ্ঠানের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ওই সময়ের মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি। ১৯৮৬ সাল থেকে পাকাপাকিভাবে এই জগতে আসি।

কবে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করেন?

তোচন ঘোষ : সময়টা মনে পড়ছে না। প্রথম অনুষ্ঠান করি বাঁকুড়ায়। আমার পার্টনার ছিলেন বিশু চক্রবর্তী। ওই জলসায় ছিলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়-উৎপলা সেন ও আরতি মুখোপাধ্যায়। খেলোয়াড় সুব্রত ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। দারুণ সাড়া পাই। এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। ধীরে ধীরে গানের ও সিনেমার শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। উদ্যোক্তরাও ডাকতে শুরু করেন।

নামকরা গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গে জলসা করেছেন, এখনও করছেন। এই তালিকায় কারা কারা রয়েছেন?

তোচন ঘোষ : কার কথা বলব? আমি সেই সৌভাগ্যবান জলসা আয়োজক যে দেশের চার প্রজন্মের গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে কাজ করেছি। প্রথম প্রজন্মে রয়েছেন মহম্মদ রফি, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, কিশোরকুমার। দ্বিতীয় প্রজন্মের তালিকায় রয়েছেন কুমার শানু, অভিজিৎ ও অলকা ইয়াগনিক। তৃতীয় প্রজন্মের তালিকায় রয়েছেন শান, সোনু নিগম, শ্রেয়া ঘোষাল আর চতুর্থ প্রজন্মের তালিকায় রয়েছেন অরিজিৎ।

আর কত প্রজন্মের সঙ্গে কাজ করবেন?

তোচন ঘোষ : মা কালীর আশীর্বাদে আমি দেশের প্রায় সব শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করে সবার ভালোবাসা পেয়েছি। বলিউডের সঞ্জীবকুমারের সঙ্গে কাজ করেছি, অকালে তাঁকে হারিয়েছি, তাঁর কথা খুব মনে পড়ে।

আপনার এক অনুষ্ঠানে মান্না দে'র গানের সঙ্গে উপস্থাপক ছিলেন রাহুলদেব বর্মণ। ভিডিয়ো দেখেছি।

তোচন ঘোষ : মান্নাদাকে নিয়ে অনেক অনুষ্ঠান করেছি। খুব

গুণী গায়ক ছিলেন। আমাকে খুব ভালোবাসতেন। ওঁকে নিয়ে বসুশ্রী হলে একক অনুষ্ঠান করি। সেখানে সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন পঞ্চমদা। পঞ্চমদার সঙ্গে আমার পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। মুম্বইয়ে যখন এই অনুষ্ঠানের কথা বলতে তাঁর বাড়ি যাই তখন তিনি লুঙ্গি পরেছিলেন। মান্নাদা'র অনুষ্ঠানের কথা শুনে বলেন, মান্নাদা'র জন্য যেখানে খুশি যেতে পারি। ওই অনুষ্ঠানে মান্নাদা আর পঞ্চমদার মধ্যে মাইক কাড়াকাড়ি হয়। মান্নাদা পঞ্চমদা'র প্রশংসা করায় তিনি মাইক কেড়ে নিয়ে বলেন, 'মুম্বই থেকে ছুটে এলাম আপনার গানের প্রশংসা করার জন্য আর এখানে এসে দেখছি আপনি আমার প্রশংসা করছেন। ওই জলসায় মান্নাদা ২৯টা গান করেন। পঞ্চমদা তাঁকে একটা গান গাওয়ার অনুরোধ জানালে মান্নাদা বলেন, একটা কেন তুমি চাইলে একশোটা গান গাইতে পারি। পঞ্চমদার অনুরোধে 'সন্ন্যাসী রাজার' সেই বিখ্যাত—'কাহারবা নয় দাদরা বাজাও' গানটি গান।...ওই অনুষ্ঠানের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়।

বসুশ্রীর পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানের কথা কিছু বলুন

তোচন ঘোষ : বসুশ্রীর পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বসুশ্রী সিনেমা হলের কর্ণধার মন্টু বসু। গত শতকের পাঁচের দশক থেকে শুরু করে প্রতিবছর পয়লা বৈশাখের সকালে জলসা বসত। এই জলসায় অংশ নিতেন তাবড় তাবড় গায়ক-গায়িকারা আর সিনেমার তারকারা। কে ছিলেন না ওই তালিকায়? শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এমনকী লতা মঙ্গেশকর, সুচিত্রা সেনও অংশ নেন ওই জলসায়। কলকাতায় থাকলে কিশোরকুমারও আসতেন। আর জলসার প্রাণপুরুষ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যাঁর চেষ্টায় শুরু হয় এই বসুশ্রীর জলসায় তিনি তো থাকতেনই। এই জলসায় একবার নিজের গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেন মহানায়ক উত্তমকুমার। আবৃত্তি করতেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ১৯৮০ সালে মহানায়ক চলে যাওয়ার পরও জলসা থেমে থাকেনি। তবে ১৯৮৯ সালে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মারা যাওয়ার পর আর এই জলসা চালিয়ে নিয়ে যেতে চাননি বসুশ্রীর কর্ণধার মন্টুবাবু। ১৯৭৮ সাল থেকে আমি জলসার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ি। ২০১৪ সালে জলসা সামলানোর দায়িত্ব আমার কাঁধে এসে পড়ে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, মন্টুবাবু এখানে আমার অফিস করার অনুমতি দেন। ওই বছর প্রয়াত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও বসুশ্রীর কর্ণধার মন্টু বসুর স্মরণে অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রির টাকা দুঃস্থ শিশুদের সাহায্যে তুলে দেওয়া হয়।

এই অনুষ্ঠানের কোনো স্মরণীয় ঘটনা মনে আছে?

তোচন ঘোষ : একবার অনুষ্ঠানে মহানায়ক উত্তমকুমার আসেন। সেখানে ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ওই সময় বাংলা চলচ্চিত্র জগতের একটা সমস্যা নিয়ে দু'জনের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়। সৌমিত্রদা মহানায়ককে দেখে অস্বস্তিতে গুটিয়ে থাকায় উত্তমদা সৌমিত্রদাকে বলেন, কিরে পুলু পয়লা বৈশাখে বড়োদের প্রণাম করতে হয় সেটা ভুলে গেছিস নাকি? তখন সৌমিত্রদা গিয়ে উত্তমদাকে প্রণাম করেন আর মহানায়ক তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। ওই বিরল দৃশ্য শিশির স্টুডিয়োর কর্ণদা ক্যামেরবন্দি করেন ও লাখ ছবি বিক্রি হয়। যা এক ইতিহাস।

"আমি সেই সৌভাগ্যবান জলসা আয়োজক যে দেশের চার প্রজন্মের গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে কাজ করেছি।"

মুখোমুখি—

জ্যোতি বসু আমার প্রথম গানের অ্যালবাম উদ্বোধন করেন : অনুশীলা বসু

রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাশাপাশি পিছিয়ে পড়া মানুষদের সাহায্যের জন্য সবসময়ই এগিয়ে আসেন লোকসভার প্রয়াত অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে অনুশীলা বসু। তবে এটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। গানের চর্চার পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজ করেও তিনি সকলের কাছে বিশেষ পরিচিত। তাঁর কথা তুলে ধরছেন বিশাখা মিত্র।

বাবা ছিলেন একাধারে লোকসভার অধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অন্যদিকে, বিশিষ্ট আইনজীবী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর খ্যাতি ও নাম ছিল দেশ জোড়া। কিন্তু কখনোই বাবার আলোয় আলোকিত হতে চাননি মেয়ে অনুশীলা বসু। তাঁর পরিচয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়িকা। এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান চালানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সেবায় ব্রতী। কাজের সূত্রে ব্যস্ত থাকেন কখনো শান্তিনিকেতনে কখনো আবার কলকাতায়। তাঁর নিজস্ব ট্রেডমার্ক কপালে লম্বা বিন্দি ও চমকালো রঙিন শাড়ি। হাই প্রোফাইল জীবনে অভ্যস্ত হলেও অনুশীলা বসু মাটির কাছাকাছি থাকতেই বেশি পছন্দ করেন।

গানের জগতে যেভাবে আসা

বনেদি বাঙালি পরিবারের মেয়ে। তাই ছোটো থেকেই তাঁর গান ও নাচের প্রতি টান ছিল। বাড়িতে রবি ঠাকুরের গান শুনতেন। কিন্তু গান নিয়ে চর্চার কথা সেভাবে কখনো ভাবেননি। অনুশীলা বসুর কথায়, '১৯৮০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন নিয়ে পড়তাম। হাজরা ল কলেজের উল্টোদিকে থাকতেন বাণী ঠাকুর। ওই সময় তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের নামকরা গায়িকা ছিলেন। এক বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি ও তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যাই। ধীরে ধীরে তাঁর সান্নিধ্যে আসি। ওই সময় আমি অমিয় রায়ের অধীনে ক্যাজুয়ালি গানের চর্চা করতাম। কিন্তু বাণীদির সঙ্গে পরিচয়ের পর যাবতীয় চিন্তাভাবনা আর ভালোলাগা গানকে ঘিরেই হয়। গানে জীবন সঁপে দিয়েছিলাম। বাণীদির মিউজিক্যাল কনসোর্টিয়াম, কিংশুক'য়ের সদস্য হই। আর এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত হওয়ার পর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সংযুক্তা পানিগ্রাহীদের সঙ্গে পরিচয় হয়। একসঙ্গে অনুষ্ঠান করার সুযোগও পাই। এরপর আরো বেশি করে গানের প্রেমে পড়ি।' যেকোনো কারণেই হোক বাণীদি আমার মতামতকে খুব বিশ্বাস করতেন আর গান-বাজনা নিয়ে আমাকে কিছু করতে বলতেন। যখন বাণীদি ক্লাস করা বন্ধ করে দেন, তখন আমি কলকাতার বন্ডেল রোডে 'কলাভৃৎ' চালু করি।'

গানের অ্যালবাম উদ্বোধনে জ্যোতি বসু

সঙ্গীত জীবনের দুটি ঘটনা আজও ভুলতে পারেন না অনুশীলা। তাঁর জীবনের প্রথম গানের অ্যালবাম 'যে আছে অন্তরে'র উদ্বোধক ছিলেন ওই সময়ের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। তাঁর বাবা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় গানের ন্যারেশন করেন। অন্য গানের অ্যালবাম 'তোমার আকাশ দাও' রিলিজ হয় শান্তিনিকেতনে। জাভেদ আখতার ও শাবানা আজমি এই

অ্যালবাম প্রকাশ করেন। ওই অ্যালবামে শাবানা রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরিজি আবৃত্তি করেন। আর গানের ন্যারেশনে ছিলেন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। টানা ৫ বছর রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমির সঙ্গে কাজ করেন অনুশীলা। তিনি ড রত্না ভট্টাচার্যের অধীনে বাংলা বিষয়ে পেপার লেখেন, যা পরে বই আকারে বেরোয়।

দেশে-বিদেশে গানের অনুষ্ঠান

অনুশীলা একাধিকবার গানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। অনুষ্ঠান করেন মার্কিন দেশের আটলান্টা, ক্যালিফোর্নিয়া, বাংলাদেশের ঢাকা ও ত্রিপুরায়। একাধিকবার দিল্লিতে অনুষ্ঠান করেন। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিত অনেকবার তাঁর অনুষ্ঠানে আসেন। কলকাতার প্রায় সব প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠান করেছেন। একবার ১২৫জনকে নিয়ে অনুষ্ঠান করেন। রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষে রবীন্দ্রসদনে কবির ১০টা গান নিয়ে ১৫০জন পারফর্ম করেন, যা তাঁর কাছে গর্বের বিষয়। ২০২২ সালে ১৫ আগস্ট কলকাতার আইসিসিআরএ 'ভারত ভাগ্য বিধাতা' নামে এক মেগা শোও করেন।

স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান কলাভৃৎ

অনুশীলা বসুর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান এই কলাভৃৎ। এখানে গান, নাচ, ছবি আঁকা, আবৃত্তি, তবলা, সিন্থেসাইজার, পাশাপাশি টেবিল টেনিসও শেখানো হয়। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নানা অনুষ্ঠান হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য করা হয় গানের কর্মশালা। কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসাবে আসেনকণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, মান্না দে, বাংলাদেশের গায়িকা রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, নৃত্যগুরু সংযুক্তা পানিগ্রাহী ও অমর পালের মতো কিংবদন্তিরা। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ছাড়াও বাইরের লোকেরাও আসেন। গানের পাশাপাশি কলাভৃৎ-এ লোকশিল্প পটচিত্র নিয়েও কাজ হয়। মেদিনীপুর থেকে পটশিল্পীদের আনা হয়। কলাভৃৎ-র পরিচালক বলেন, 'আগামীদিনে পটচিত্রকরদের নিয়ে আরো কর্মশালা করতে চাই।'

কলাভৃৎ পরশমণি পাশে থাকার প্রয়াস

কলাভৃৎ সংস্থার মাধ্যমে অনুশীলা সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের সাহায্য করেন। তাঁর উদ্যোগের নাম 'কলাভৃৎ পরশমণি পাশে থাকার প্রয়াস'। এই প্রকল্পে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আক্রান্তদের ত্রাণ ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করা হয়। প্রয়াসের পক্ষ থেকে মেদিনীপুরের বেশ কিছু অল্পবয়সি মেয়েকে লেখাপড়ার জন্য সাহায্য করার পাশাপাশি তাদের আর্থিক স্বনির্ভরতার পথ দেখানো হয়। ওই মেয়েদের হাতে ওষুধ, পোশাক, বইপত্তর, সেলাই মেশিন তুলে দেওয়া হয়। কলাভৃৎ পরশমণি পাশে থাকার প্রয়াস-এর পক্ষ থেকে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মেয়েদের ক্ষমতায়নের জন্য নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

মোহনবাগান প্রেম

সংস্কৃতি ও সমাজসেবার সঙ্গে সঙ্গে অনুশীলা বসু মোহনবাগানের অন্ধ ভক্ত। এক সময় এই দলে শুধুমাত্র পুরষদের সদস্যপদ নেওয়ার রেওয়াজ ছিল। ৪ থেকে ৫ বছর লড়াই করে সদস্য পদ আদায় করেন তিনি। অনুশীলাই প্রথম মোহনবাগানের মহিলা সদস্য। যা তিনি গর্বের সঙ্গে বলেন।

আমার জীবনময় রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসঙ্গীত

তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা কী? অনুশীলা বলেন, 'এক কথায় বোঝানো কঠিন। আমার শয়নে-স্বপনে-জাগরণে রবীন্দ্রনাথ। তিনি আমাদের সুখ-দুঃখের চিরসাথী। কবি নিজেই বলেছিলেন, আমি তোমাকে পেয়েছি হৃদয় মাঝে। আমাদের সবার হৃদয়ে কবি।' রবীন্দ্রনাথের গানের কপিরাইট উঠে যাওয়া নিয়ে অনুশীলার মত, 'গান নিয়ে আরো বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা হওয়া দরকার। আমি গানের বোদ্ধা নই, গান ভালোবেসে গাই, যতদিন পারব শ্রোতাদের গান শোনাতে চাই।'

কিশোরকুমারকে বাপি বলেই ডাকতাম : শ্রমণা চক্রবর্তী

গায়িকা ও অভিনেত্রী রুমা গুহঠাকুরতার একমাত্র মেয়ে শ্রমণা চক্রবর্তী। যিনি এই সময়ের অন্যতম রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী। তাঁর কাকা অভিরূপ গুহঠাকুরতা ও পিসি ছিলেন ঋতু গুহ। সত্যজিৎ রায় ছিলেন সম্পর্কে দাদু। সেই শ্রমণা চক্রবর্তী অকপটে নিজের সম্পর্কে অনেক অজানা কথা বললেন।

প্রশ্ন : বেঙ্গালুরুতে কত বছর হল?

শ্রমণা চক্রবর্তী : স্বামীর চাকরির সূত্রে ২১ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাউথ বেঙ্গালুরুতে আছি।

প্রশ্ন : শেষ কবে কলকাতায় আসেন?

শ্রমণা চক্রবর্তী : বছর ২ আগে কলকাতায় গিয়েছিলাম। তবে

এখানে বসে কলকাতার খবরাখবর সবই পাই।

প্রশ্ন : বেঙ্গালুরুতে বাংলা গানের চর্চা কেমন হয়?

শ্রমণা চক্রবর্তী : এখানের বাঙালিরা ভালোই গান-বাজনার চর্চা করেন। এখানে পরিচালক সৃজিত মুখার্জি ও গায়ক-সুরকার অনুপম রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি এই টান কী করে?

শ্রমণা চক্রবর্তী : ছোটোবেলা থেকে আমি রবীন্দ্রনাথের গান শুনে বড়ো হয়েছি। মা রুমা গুহঠাকুরতা ও বাবা অরূপ গুহ ঠাকুরতার কথা সবাই জানেন। আমার দিদা, পিসি, কাকাও রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশিষ্ট গায়ক-গায়িকা ছিলেন। তাই সূত্রে রবিঠাকুরের গান আমার রক্তে।

প্রশ্ন : গানের তালিম কার কাছে?

শ্রমণা চক্রবর্তী : রবীন্দ্রনাথের গান প্রথম শিখি আমার দিদিমা সীতাদেবীর কাছে। তাঁকে বলা হত রবীন্দ্রনাথের পঞ্চকন্যার একজন। পরে গান শিখি জর্জ বিশ্বাস, আমার কাকা অভিরূপ গুহঠাকুরতা ও পিসি ঋতু গুহ-র কাছে।

প্রশ্ন : জর্জ বিশ্বাস ও ঋতু গুহর কাছে গান শেখার অভিজ্ঞতা কেমন?

শ্রমণা চক্রবর্তী : মাত্র ৬ বছর বয়সে দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে গান শেখা শুরু করি। তাঁকে আমি 'গান দাউ' বলে ডাকতাম। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। ঋতু গুহ ছিলেন আমার পিসি, তাঁকে আমি 'পিমপিম' বলে ডাকতাম। পিমপিম গান শেখানোর ক্ষেত্রে খুব কড়া ছিলেন। আমাকে সব কিছু উজাড় করে দেন, তার কতটুকু নিতে পেরেছি জানি না! পরে আরও অনেক গুণী শিল্পীদের সান্নিধ্যে এসেছি।

প্রশ্ন : যেমন?

শ্রমণা চক্রবর্তী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, ভূপেন হাজারিকা আরো অনেকেই। ওঁদের আমি জ্যেঠু, কাকা বলে ডাকতাম। সবার কাছে কিছু না কিছু শিখেছি।

প্রশ্ন : আর কিশোরকুমার?

শ্রমণা চক্রবর্তী : উনি আমার নিজের বাবা না হলেও কিশোরকুমারকে আমি বরাবর 'বাপি' বলে ডাকতাম। তাঁকে কোনওদিন কিশোরকুমার হিসাবে দেখিনি। বাপির তারকাসুলভ আচরণ ছিল না। উনি বাইরে একরকম ছিলেন আর ঘরের মধ্যে অন্যরকম ছিলেন। পোশাক ছাড়ার মতো কিশোরকুমারের সত্ত্বা ছেড়ে আভাসকুমার (তাঁর আসল নাম) হয়ে ঘরে ঢুকতেন। ছোটোবেলায় বাপি গুনগুন করতেন, আর তাই শুনে আমি ঘুমিয়ে পড়তাম, পরে বাপির কাছে শিখেছি কীভাবে গান গাইতে হয়। ভয়েস ট্রেনিং, গানের উচ্চারণ সব কিছু শিখি। বিদেশি ছবি দেখার অভ্যাস বাপির কাছ থেকেই পাই। তখন বুঝতাম না, যাকে পর্দায় দেখছি, সেই মানুষটাকে বাপি বলে লাকি। ২টো সত্ত্বা আলাদা করতে পারিনি। এখন ভাবলে অবাক লাগে।

প্রশ্ন : মা রুমা গুহঠাকুরতা ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর কোন গুণ মেয়ে হিসাবে পেয়েছেন?

শ্রমণা চক্রবর্তী : (হেসে) আমি বোধহয় মায়ের কোনও গুণই পাইনি। একটু-আধটু গান গাইতে পারি এই যা।

প্রশ্ন : মায়ের মতো সিনেমায় অভিনয় করতে ইচ্ছে হয়নি?

শ্রমণা চক্রবর্তী : না, অভিনয় আমাকে সেভাবে কোনওদিন টানেনি।

প্রশ্ন : মায়ের অভিনীত কোন কোন ছবি মনে দাগ কাটে?

শ্রমণা চক্রবর্তী : কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলব? গঙ্গা, আশিতে আসিও না, পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী, বেনারসী আর সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনার ছবিগুলো।

প্রশ্ন : আপনি প্রথম কোন সিনেমায় প্লেব্যাক করেন?

শ্রমণা চক্রবর্তী : সত্যজিৎ রায়ের 'শাখা-প্রশাখা'। তখন আমার বয়স ১৭ থেকে ১৮ বছর হবে।

প্রশ্ন : ভয় লাগেনি, অত বড়ো মাপের পরিচালকের সঙ্গে কাজ করতে?

শ্রমণা চক্রবর্তী : সত্যজিৎ রায়কে আমি কোনওদিন সত্যজিৎ রায় হিসাবে দেখিনি। উনি ছিলেন আমার মায়ের মামা, তাই আমি তাঁকে দাদু বলে ডাকতাম। দাদু একদিন ফোন করে জানতে চান, এই গানটা জানিস? তখন জানতাম না। পরে শিখে নিয়েছিলাম। শাখা-প্রশাখা'র পর দাদুর আগন্তুক ছবিতে 'বাজলো কাহারো বিনা মধুর স্বরে' গান খুব জনপ্রিয় হয়।

প্রশ্ন : এরপর আর কোনও সিনেমায় প্লেব্যাক করেননি?

শ্রমণা চক্রবর্তী : সৃজিত মুখার্জির 'জাতিস্মর' ছবিতে গান করার জন্য ডাকেন কবীর সুমন। তাঁর পরিচালনায় গেয়েছিলাম, 'হলে যদি হলে সখা'। এই গানটিও হিট হয়।

প্রশ্ন : ডিজিটাল যুগে এখন না শিখে সবাই গায়ক-গায়িকা হচ্ছেন, আর রেফারেন্স হিসাবে কিশোরকুমারের নাম করেন। এ নিয়ে কী বললেন?

শ্রমণা চক্রবর্তী : গলা না থাকলে কিংবা সুরের জ্ঞান না থাকলেও প্রযুক্তির সাহায্যে শিল্পী হওয়া যায়। কিন্তু এরা কখনও বেশি দূর এগোতে পারবে না। চর্চা না থাকলে কোনওভাবে গানের সুর ও স্বর ঠিকঠাক লাগে না। চটকদারির মাধ্যমে একটা জায়গা পর্যন্ত যাওয়া যায়। তারপর আর এগোনো যায় না। আমি মনে করি সঙ্গীতচর্চা একটা সাধনা। হ্যাঁ, অনেকে আমার বাপি কিশোরকুমারের নাম রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করেন। কিন্তু তাদের জানা নেই, গান নিয়ে বাপির নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের কথা। গুরুর কাছে নাড়া বেঁধে গান না শিখলেও বাপি সব ধরনের গান শুনে শুনে নিজেকে তৈরি করেন। বাপি বলতেন কোনও গান খারাপ নয়।

"সত্যজিৎ রায়কে আমি কোনওদিন সত্যজিৎ রায় হিসাবে দেখিনি। উনি ছিলেন আমার মায়ের মামা, তাই আমি তাঁকে দাদু বলে ডাকতাম।"

মুখোমুখি—

দিদি ইন্দ্রাণী সেনের সঙ্গে আমার তুলনা হয় না : শ্রাবণী সেন

রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতম জনপ্রিয় গায়িকা শ্রাবণী সেন। মা ছিলেন সুমিত্রা সেন আর দিদি ইন্দ্রাণী সেন। তাঁর গায়কিতে এনেছেন এক নিজস্ব ধারা। শিল্পীর সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতা।

প্রশ্ন : সাংবাদিক শ্রাবণী সেনকে মনে পড়ে?

শ্রাবণী সেন : হ্যাঁ মনে পড়ে। গানের জগতে আসার আগে মিত্র প্রকাশনীর মহিলাদের পত্রিকা 'মনোরমা'য় পুরো সময়ের জন্য সাংবাদিকতা করতাম। সাংবাদিকতার সূত্রে অনেক কিছু শিখি, জানি অনেক মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরে ওই পত্রিকা উঠে যায়।

প্রশ্ন : পরে সেলিব্রিটি হয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতে কেমন লাগে?

যদি মা সুমিত্রা সেনের হয় তবে অন্যদিকে, গান শোনানোর পুরো কৃতিত্ব ছিল বাবার। নিজে গান না শিখলেও সব ধরনের গান শোনানোর ক্ষেত্রে বাবা ছিলেন উৎসাহী। এছাড়া আমার জীবনে দিদি ইন্দ্রাণী সেন ও সাগর সেনের বড়ো ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন : দিদি ইন্দ্রাণী সেনের সঙ্গে কখনো তুলনায় পড়তে হয়নি?

শ্রাবণী সেন : দিদির সঙ্গে আমার কোনো তুলনা হয় না। দিদি আমার চেয়ে ৯ বছরের বড়ো, ও অনেক গুণী, বিদূষী আবার অসাধারণ গান করেন। দিদি অনেকদিন ধরে গান শিখে এই

শ্রাবণী সেন : নিজেকে কখনো সেলিব্রিটি মনে করি না। গান ভালোবাসি তাই গান করি। তবে এই অভিজ্ঞতাও বেশ ভালো। পুরোনো বন্ধু ও সতীর্থদের সঙ্গে দেখা হলে ভালো লাগে। অনেক কথা মনে পড়ে।

প্রশ্ন : কতদিন ধরে গান করছেন?

শ্রাবণী সেন : ৩ দশকেরও বেশি সময় ধরে গান করছি।

প্রশ্ন : আপনার সঙ্গীতজীবনে কার অবদান বেশি?

শ্রাবণী সেন : গান শেখা বা পেশা হিসাবে এটাকে বাছার কৃতিত্ব

জগতে আসেন।

প্রশ্ন : আর আপনি?

শ্রাবণী সেন : অনেক পরে গানবাজনা শুরু করি। শুরুটা মায়ের কাছে ও পরে গীতবিতান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।

প্রশ্ন : কীভাবে গানের পেশায় এলেন?

শ্রাবণী সেন : শুরুতে গানের প্রতি আমার বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়নি। রীতিমতো ধরে বেঁধে আমায় গান করানো হত। এমএসসি পাশ করার পর আমার আর কিছু করার ছিল না। মা বললেন, 'হয়

গান কর, না হলে বিয়ে কর—', সেই যে আমি গানে আক্ষরিক অর্থেই আশ্রয় নিলাম, এখনো সেই ছায়াতে রয়েছি।

প্রশ্ন : আপনার প্রথম অ্যালবাম কী?

শ্রাবণী সেন : আমার প্রথম অ্যালবাম বেরোয় ১৯৯৩ সালে 'আমার একটি কথা'। এরপর ১৯৯৬ সালে দ্বিতীয় অ্যালবাম বেরোয় 'বন্ধু রহো সাথ'।

প্রশ্ন : কোন সিনেমায় প্রথম নেপথ্য কণ্ঠ দেন?

শ্রাবণী সেন : রাজা সেনের 'চক্রব্যূহ'। ২০০০ সালে ঋতুপর্ণ ঘোষের 'উৎসব' ছবিতে 'অমল ধবল পালে লেগেছে' গান গেয়ে জনপ্রিয়তা পাই। এরপর একে একে গান করি গৌতম ঘোষের 'দেখা', ঋতুপর্ণ ঘোষের 'বাড়িওয়ালি', সুব্রত সেনের 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা', অঞ্জন দাসের 'সাঁঝবাতির রূপকথা', পিনাকি চৌধুরীর 'বালিগঞ্জ কোর্ট', উর্মি চক্রবর্তীর 'হেমন্তের পাখি', নন্দিনী-শিবপ্রসাদের 'বেলাশেষে' প্রভৃতি ছবিতে।

প্রশ্ন : সিনেমা ছাড়াও আপনি বেশ কিছু টেলিফিল্ম ও সিরিয়ালে গান করেছেন, সেগুলো কী?

শ্রাবণী সেন : হ্যাঁ, বেশ কিছু সিরিয়ালেও কাজ করেছি। যেমন, শেষের কবিতা, চতুরঙ্গ, চেনা মুখের সারি, এখানে আকাশ নীল। সব নাম মনে পড়ছে না। আর একটা ছবির কথা মনে পড়ছে, মৈনাক ভৌমিকের 'একান্নবর্তী'।

প্রশ্ন : টিভিতে এখন নতুন প্রতিভা খোঁজার জন্য গানের রিয়েলিটি শো খুব জনপ্রিয়। আপনাকে রিয়েলিটি শোয়ে দেখা যায় না কেন?

শ্রাবণী সেন : রিয়েলিটি শোয়ে আমাকে ডাকা হয় না। প্রতিযোগীরা বিশেষ কিছু গায়ক-গায়িকার গান করেন। সেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলাদা কোনো পর্ব দেখা যায় না।

প্রশ্ন : এইঈ ধরনের শো থেকে কি নতুন প্রতিভা উঠে আসে?

শ্রাবণী সেন : নতুনদের কাজ দেখানোর অন্যতম মাধ্যম এই রিয়েলিটি শো। এখান থেকে অনেকে যেমন উঠেছে আবার অচিরে হারিয়েও গেছে। নিজেকে ধরে রাখতে হবে। গান-বাজনা একটা সাধনা।

প্রশ্ন : আপনার নিজের গান শেখানোর প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

শ্রাবণী সেন : শ্রাবণী সেন মিউজিক আকাদেমি। ২০১৪ সালে আকাদেমির পথ চলা শুরু হয়। কলকাতা ছাড়া বর্ধমান, বারাসাত, নৈহাটি, উত্তরপাড়া, হাওড়া, কলকাতার ডানলপ, বেহালা, সল্টলেক ও কবীর রোডে শাখা আছে। জুনিয়র ও সিনিয়র দুটি বিভাগ।

প্রশ্ন : নতুন প্রজন্মের সঙ্গে কাজ করছেন। রবীন্দ্রনাথের গানে কি তাদের উৎসাহ রয়েছে?

শ্রাবণী সেন : অবশ্যই। নতুনদের গান শেখাতে আমার খুব ভালো লাগে। আমার পাঁচশোর বেশি ছাত্রছাত্রী রয়েছে।

প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথের গানের কপিরাইট উঠে যাওয়ায় শিল্পীদের গান করার স্বাধীনতা অনেক বেড়েছে, এতে কি গানের বিশুদ্ধতা হারাচ্ছে?

শ্রাবণী সেন : কপিরাইট উঠে যাওয়ায় অনেকে নিজের মতো গাইছেন। রবীন্দ্রনাথের গান বাণীপ্রধান, সুরেরও বিশাল গুরুত্ব। কড়া বাঁধন দিয়ে শিল্পীকে বাঁধা যায় না, এটা ঠিক। তবু এই পরিস্থিতিতে বলব রবীন্দ্রসঙ্গীতের মান নির্ধারক হিসাবে কোনো একটা সংস্থার থাকা উচিত ছিল।

প্রশ্ন : আপনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে আলাদা একটা ধারা এনেছেন। এটা কি শ্রাবনী সেনের ধারা বলা যায়?

শ্রাবণী সেন : আমি কোনো নতুন ধারা আনিনি। আমার মা ছিলেন প্রখ্যাত গায়িকা সুমিত্রা সেন। আমার গায়কির মধ্যে মায়ের ধারা বজায় রেখেছি। যেমন, খোলা গলায় গান করা। স্পষ্ট উচ্চারণ ও স্বরলিপি মেনে বাণী অনুযায়ী শুদ্ধ সুরে গান গাওয়া। আমি কোনো ম্যানারিজমে আক্রান্ত হইনি।

প্রশ্ন : তিন দশক ধরে রবীন্দ্রনাথের গান করছেন। তাঁর গানে কী পেলেন?

শ্রাবণী সেন : ৩৬টা বছর ধরে রবীন্দ্রনাথের গান করে চলেছি। সেই যে রবীন্দ্রনাথের গানে আশ্রয় নিলাম, এখনো সেই ছায়াতেই জীবনযাপন করি। রবীন্দ্রনাথের গান আমার ঘর-বাড়ি-আশ্রয়। এই গান নিয়েই থাকতে চাই আর শ্রোতাদের শুনিয়ে যেতে চাই।

ভ্রমণ—

ঝাড়খণ্ডের মলুটী যেন মন্দিরের নগরী

রামপুরহাট থেকে তারাপীঠে পুজো দিয়ে একবারের জন্য ঘুরে আসাই যায় মন্দিরময় মলুটীতে। দেখতে পাওয়া যাবে প্রাচীন বাংলার প্রায় ভুলতে বসা ইতিহাসকে। জানা যাবে একচালা আর চারচালা মন্দিরের টেরাকোটার কাহিনিকে। লিখেছেন — দীপঙ্কর ব্যানার্জি

তারা মায়ের দর্শন করে তারাপীঠ ছাড়লাম। চললাম মলুটী দেখতে।

তারাপীঠ মন্দিরের তোরণের তলা দিয়ে চলেছি। নতুন ঝাঁ চকচকে রাস্তা। বারশাল তারপরেই মোরগ্রামগামী জাতীয় সড়কের ওপর মানসুবা মোড়। রাস্তা টপকে রামপুরহাট বাইপাস ধরে সোজা মলুটীর উদ্দেশে। আর মাত্র বারো কিলোমিটার। একটু এগোতেই পেলাম রেললাইন। কপাল ভালো। লেবেল ক্রসিংয়ের গেট খোলা পেলাম। রাস্তা এখন আর আগের মতো চওড়া নয়। সরু চিলা নদীকে পেরোতেই ঢুকে পড়লাম ঝাড়খণ্ডে রাজ্যে। এরপরে হালকা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঢেউ খেলানো রাস্তা ধরে এগোতে থাকি।

ছোটোনাগপুর মালভূমির ঢেউ শুরু হয়ে গেছে। একটা বাঁক নিয়ে এসে দাঁড়াই মলুটী গ্রামে। গ্রামে ঢোকার আগেই রাস্তার বাঁ পাশে চোখে পড়ে মলুটী লেখা সাইনবোর্ডটি। এরপর অবশ্য আর কোনওরকম বোর্ড পাইনি। কোনদিকে যাব বা গ্রামের কোথায় কোন কোন মন্দির আছে তাও বোঝা বেশ মুশকিল। তবে এই ব্যাপারে গ্রামের প্রতিটি মানুষ ভীষণ সাহায্য করেছিলেন। অনেকে আবার এগিয়ে এসে সঠিক পথ দেখিয়েও দিলেন। গ্রামের নানা জায়গায় সব মন্দিরগুলোর অবস্থান সহ একটি ম্যাপ বা সেরকমভাবে যদি কিছু দিক নির্দেশ করা সাইন বোর্ড থাকত তাহলে বিশেষ সুবিধা হত এই মন্দিরময় মলুটী গ্রামকে দেখতে এবং জানতে।

ঐতিহাসিকদের মতে, পঞ্চদশ শতকের নানকর রাজার রাজধানী ছিল এই মলুটী গ্রাম। পরে গৌড় সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এই গ্রামটি উপহার দিয়েছিলেন গরিব ব্রাহ্মণ সন্তান বসন্ত রায়কে। বসন্ত রায় সুলতানের এক পোষা

বাজপাখিকে ধরে এনে ফেরত দেওয়ার জন্য নাকি পুরস্কারস্বরূপ এই গ্রাম উপহার পান। তারপরেই ওঁর নাম দেওয়া হয় বাজবসন্ত। আবার আরেকটি মতে, বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের অঞ্চল মল্লহাটি থেকেই মলুটী নাম হয়েছে। বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, উত্তরে পাকুড় এবং ছোটনাগপুর মালভূমির কিছু অংশ নিয়েই তখন এই মল্লভূম এবং মল্ল রাজাদের সাম্রাজ্য ছিল।

এই গ্রামে একই জায়গায় এতগুলো মন্দির তৈরি হওয়ার পেছনেও একটা ইতিহাস আছে। বাজবসন্ত বা তাঁর বংশধররা বড়ো বড়ো প্রাসাদ তৈরির বদলে মন্দির নির্মাণ করতেন। রাজ পরিবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা শরিকে ভেঙে যায়। প্রতিটি শরিক নিজেদের তরফে মন্দির তৈরি করতে থাকেন একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। এভাবেই মলুটি গ্রাম ধীরে ধীরে মন্দিরে মন্দিরে ভরে ওঠে।

অতীতে শুঙ্গ বংশের (১৮৫ খ্রিষ্টপূর্ব - ৭৫ খ্রিষ্টপূর্ব) সময় এই মলুটীর সুখ্যাতি ছিল গুপ্তকাশী নামে। বৌদ্ধ এবং তান্ত্রিক সাধকরা এখানে আসতেন তাঁদের সাধনা করতে। তারই সূত্র ধরে আমরা প্রথমে দেখতে পাই মলুটী গ্রামের মৌলিক্ষ্যা মাতার মন্দিরটিকে। এটি সবচেয়ে পুরোনো ঐতিহাসিক এক নিদর্শন। এও বলা হয় আদি শঙ্করাচার্য কাশী যাওয়ার পথে এখানে থেমেছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম বিরোধী হিন্দু জাগরণ আন্দোলনের সূচনা তিনি এখান থেকেই শুরু করেন।

দূরে রাস্তার বাঁ পাশে মৌলিক্ষ্যা মাতার মন্দিরের কিছু অংশ দেখা যায়।

মৌলিক্ষ্যা মাতার মন্দির চত্বরের ভেতরে, একটি গাছের নীচে দেখতে পেলাম প্রাচীন মন্দিরের কিছু ধ্বংসাবশেষ।

১৮৫৭ সালে বাঙালি তান্ত্রিক সাধক বামদেব বা বামাখ্যাপা মলুটীতে আসেন। তিনি প্রায় ১৮ মাস এই গ্রামের মৌলিক্ষ্যা মন্দিরে ছিলেন। তারাপীঠে যাওয়ার আগে প্রথমে সিদ্ধিলাভ করেন এখানেই।

এরপর প্রবেশ করি মলুটী গ্রামের ভেতরে। সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে যাই অতীতের দুর্গা দালানের দিকে। দুর্গা দালানটিও দেখার মতো।

এরপর চলে আসি মূল মন্দিরপাড়ায়। এখানে মন্দিরগুলো বাংলার একচালা ও চারচালা শৈলীর এক সুন্দর নিদর্শন। মন্দিরের প্রায় সব ক'টিই পোড়ামাটির তৈরি অর্থাৎ টেরাকোটার। টেরাকোটার বর্গাকার প্যানেল বানিয়ে মন্দিরগুলোর গায়ে বসানো হয়েছে। এই টেরাকোটার প্যানেলে রামায়ণ, মহাভারত এবং শাক্ত পদাবলীর মহিষাসুর ও মা দুর্গার যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলায় টেরাকোটার মন্দির অনেক জায়গায় আছে, তবে শাক্ত পদাবলীভিত্তিক টেরাকোটার কাজ খুব কম মন্দিরেই দেখতে পাওয়া গেছে। সে দিক দিয়ে দেখলে মলুটী'র মন্দিরগুলো বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এক অনন্য উদাহরণ। এছাড়া সাধারণ গ্রাম্য জীবনকেও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কিছু কিছু মন্দিরের গায়ে। মন্দিরের আদল একচালা ও চারচালার থাকলেও বৈশিষ্ট্যভিত্তিক কোনওটা ছোটো বা কোনওটা বড়ো।

অপেক্ষাকৃত নতুন মন্দিরগুলোর মধ্যে একটি বিশেষ মন্দিরের শৈলী বেশ চোখে পড়ে। প্রতিটি মন্দিরর মধ্যে আছে ৩টি মন্দিরের সমাবেশ। তিনটি মন্দিরের চূড়ার আদল আলাদা। একটির চূড়া হিন্দু মন্দিরের আদলে তৈরি, আর একটির চূড়া মসজিদের আদলে আর অন্যটির চূড়া গির্জার

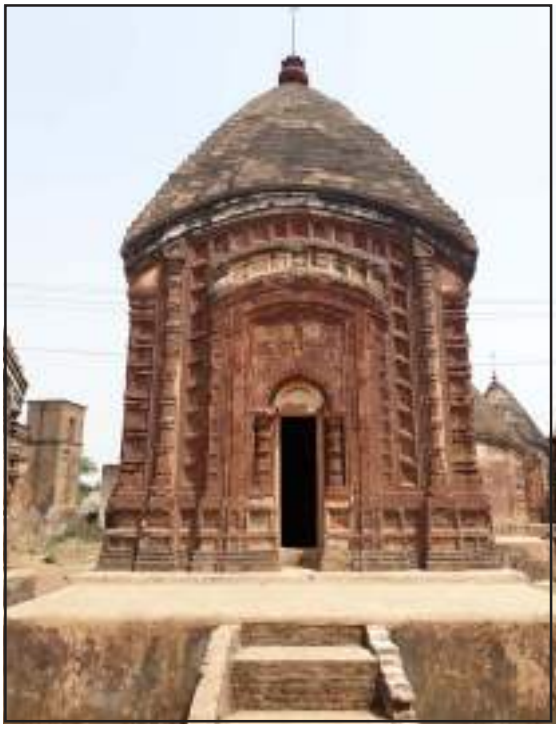

আদলে তৈরি। কয়েকটি লেখা আছে। অবশ্যই তা আদি ও সংস্কৃতের সংমিশ্রণে তৈরি। মানে একদম বুঝতে পারছি না। মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার কাজ প্যানেল খুলে নেওয়া হয়েছে।

মন্দিরগুলোয় এখন বর্তমানে Global Heritage Heritage Indian Trust মন্দিরের গায়ে বিভিন্ন লিপি বাংলাভাষায়। যা বাংলা, প্রাকৃত ওই লেখা অল্প পড়তে পারলেও এর মধ্যে দেখলাম কিছু সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়েছে বা সংস্কারের কাজ চলছে। Fund ও for Rural and Development- এর উদ্যোগে মলুটীর মন্দিররাজি সহ গোটা গ্রামটাতেই সংস্কারের কাজ চলছে। আপাতত যে কটা মন্দিরে সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে তার বেশ কয়েকটা ছবি মন্দিরের সাদা দেওয়ালের গায়ে আটকানো আছে।

শোনা যায়, শুঙ্গ বংশের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের প্রথম ব্রাহ্মণ রাজা পুশ্যমিত্র সুঙ্গের সময়কালে সেকালের বিদ্যা অধ্যায়নের স্থান হিসাবে এই মালুটী স্থাপিত হয়। আদি শঙ্করাচার্য বারাণসী যাওয়ার পথে এখানে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন। এক সময় বীরভূম ও সম্মিলিত সাঁওতাল পরগনাকে একসঙ্গে রাঢ় বাংলা বা রাঢ়বঙ্গ ও বলা হত। এই সব কিছু মিলিয়ে মলুটী আজ বিচিত্র এক ইতিহাসের সাক্ষী।

খানাপিনা—

বনেদি বাড়ির পুজোর সিগনেচার পদ

বনেদি বাড়ির পুজো মানেই এক আলাদা নস্টালজিয়া, এক আলাদা অনুভূতি। যেখানে ভিড় করে থাকে পুজো ঘিরে নানান অজানা কাহিনি। বছরের পর বছর ধরে চলে আসা ঐতিহ্য, রীতি-নীতি, আচারনিষ্ঠা আর অনেক স্মৃতিকথা। যাকেই আসলে বলে বনেদিয়ানা। বনেদি বাড়ির প্রতিটা ইট, মোটা মোটা থাম, দালান সেসব স্মৃতির জাল বুনে চলে বছরের পর বছর ধরে। এই সব পুজোর নিয়মনীতি তো আছেই সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল বনেদি বাড়ির পুজোর ভোগ, খাওয়াদাওয়া আর নৈবেদ্য। বনেদি বাড়ির পুজোর সেরকমই কিছু স্পেশাল খানাপিনা রইল।

প্রতিটি বনেদি পরিবারের খাওয়া-দাওয়াতেই থাকে এক-একটি সিগনেচার পদ। দশকের পর দশক পেরিয়ে গিয়ে আড়ম্বর, জৌলুসে ঘাটতি পরলেও বংশের রীতি একই থাকে। বদলায়নি সেইসব সাবেকি খাবার। একেক বাড়ির অবশ্য একেক রকম ভোগ নিবেদনের পালা। বৈচিত্র্য আছে নৈবেদ্যতেও। বনেদি বাড়ির পুজোর ভোগ অতিথিদের রীতিমতো তাক লাগিয়ে দেয়!

সাবর্ণ চৌধুরীদের পেঁয়াজ রসুন ছাড়া স্পেশাল চিংড়ি মালাইকারি

পেঁয়াজ রসুন ছাড়াই চিংড়ির মালাইকারি হল সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়ির সেই 'সিগনেচার পদ'। যা একবার চাখলে বারবাব

খাওয়ার জন্য মন চাইবে। কীভাবে তৈরি হয় এই উপাদেয় পদ। আসুন জেনে নেওয়া যাক। এর জন্য তেল আর ঘি মিশিয়ে কড়াইতে দিতে হবে। তার মধ্যে গরমমশলা, নুন

আর আদাবাটা দিয়ে খানিক ভারো করে মশলাটা কষতে হবে। হলুদ আর লঙ্কাগুঁড়ো জলে গুলে ওই মশলার মধ্যেই ঢেলে দিতে হবে। এরপর ওই মশলায় চিংড়িমাছগুলো দিয়ে দিতে হবে। তবে চিংড়ি মাছগুলোয় আগে থেকে নুন ও হলুদ মিশিয়ে রাখা দরকার। চিংড়ি দিয়ে একচু নাড়াচাড়ার পর এর মধ্যে কাজু বাদাম বাটা, চিনি আর নারকেলের দুধ দিয়ে দশ মিনিট ভাপালেই স্পেশাল মালাইকারি তৈরি।

শোভাবাজার রাজবাড়ির স্পেশাল আলুরদম

আজও এই বাড়ির পুজো দেখতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দর্শনার্থীদের ঢল নামে। জানা যায়, ১৭৫৭ সালে দেব পরিবারের নবকৃষ্ণ দেব গোবিন্দপুর ছেড়ে সুতানুটি প্রাসাদ গড়ে তোলেন। যেখানে আজও পুজোর দালানে মায়ের পুজো হয়।কলকাতার বিভিন্ন বনেদি বাড়িতেই পুজোর সময় রান্না হয় কিছু স্পেশাল পদ। এই বাড়ির পুজোর খাওয়াতেও থাকে বিশেষ চমক। যেমন ষষ্ঠীর দিন শোভাবাজার রাজবাড়িতে লুচির সঙ্গে হয় স্পেশাল আলুরদম। এই আলুরদমের রেসিপি বংশ পরম্পরায় 'সিক্রেট' হিসেবে চলে আসছে। বাড়ির গিন্নি এই আলুরদমে দেন স্পেশাল এক মশলা। যার গুণে আলুরদম এক স্বর্গীয় স্বাদ পায়। ওই সিক্রেট মশলার মধ্যে থাকে শুকনো লঙ্কা, সাদা জিরে গোটা, গোটা ধনে, গরমমশলা, দারচিনি, লবঙ্গ, ছোট এলাচ। এগুলো আগে শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়িয়ে নিতে হবে। আগে থেকে সেদ্ধ করা আলুর সঙ্গে এই মশলা মিশিয়ে কষানোর পর ওপরে ছড়িয়ে দিতে হবে সামান্য আমচুর। শোনা যায়, এই বাড়িতে বিশেষ অতিথিদের জন্য থাকত টিপসি পুডিং নামে এক মিষ্টি-পদ। ইংরেজ সরকারের অতিথিদের নাকি বড়ই প্রিয় ছিল এই পুডিং। কেক ও পুডিং এর সমন্বয়ে এই পদ তৈরিতে ব্যবহার হত ব্র্যান্ডি কিংবা রাম!

লাহা পরিবারের সুজির নাড়ু

উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির কাছে আরেক প্রসিদ্ধ পরিবার লাহা পরিবার। এই সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুজোর আয়োজনেও আড়ম্বরের কোনও ঘাটতি থাকে না। কথিত আছে, এই পরিবারের নবকৃষ্ণ লাহার স্ত্রী দেবী দুর্গার স্বপ্নাদেশ পান। তারপরই লাহা পরিবারে দুর্গাপুজোর শুরু হয়। এখন ১ বছর পুজো হয় ঠনঠনিয়ার লাহা বাড়িতে, পরেরবার কৈলাস বোস স্ট্রিটের লাহা বাড়িতে পুজো হয়। এই বাড়ির বিখ্যাত রান্নাগুলোর মধ্যে সুজির নাড়ু ও শিঙি মরিচ অন্যতম।

চট্টোপাধ্যায় পরিবারের কাঁচা তেঁতুলের চাঁটনি

উত্তর কলকাতার মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের চট্টোপাধ্যায় পরিবার। জমিদার রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একসময় ইংরেজ সরকারের খুব কাছের লোক ছিলেন। তাঁর বাড়ির পুজো ছিল ওই যুগে শহরে প্রসিদ্ধ। এই বাড়িতে পুজোর কাজে মহিলারা সবসময় ব্যস্ত থাকায় দেবীর ভোগ রান্না করেন ছেলেরা। এটাই রীতি। আজও এই নিয়ম চলে আসছে। কাঁচা তেঁতুলের চাটনি এই বাড়ির পুজোর খাবারের সেরা আকর্ষণ। কাঁচা তেঁতুল হাত দিয়ে ফাটিয়ে রান্না হয়। কেটে নেওয়া নিয়ম বিরুদ্ধ। এই চাটনিতে সরষে বাটা দেওয়ায় তা অন্যরকম স্বাদ করে তোলে। এবার আসা যাক একেক বনেদি বাড়ির পুজোর হরেক রকমের নৈবেদ্যের কথায়।

পাথুরিয়াঘাটার ঘোষবাড়ির পুজো

এই বনেদি বাড়িতে মা দুর্গাকে কোনও অন্নভোগ দেওয়ার রীতি নেই। তার বদলে দেওয়া হয় চন্দ্রপুলি, পেস্তার বরফির মতো নানা রকমের মিষ্টি। সঙ্গে তামার থালায় দেওয়া হয় পাঁচকলাই, আদা কুচি আর সৈন্ধব নুন। শীতল ভোগে মাকে দেওয়া হয় লুচি আর চন্দনী ক্ষীর।

শীলবাড়ির পুজো

ঘোষবাড়ির মতো শীলবাড়িতেও কোনও অন্নভোগ হয় না। এখানে মাকে দেওয়া হয় ২৮ কেজির নৈবেদ্য। ২৮টি পাত্রে এক মণ করে চাল, কলা আর মিষ্টি দিয়ে এই নৈবেদ্য দেওয়া হয়। তার বদলে মাকে লুচিভোগ দেওয়া হয়। পঞ্চমীর দিন এই বাড়িতে ভিয়েন বসিয়ে তৈরি হয় কচুরি, শিঙাড়া, নিমকি, লেডিকেনি, মালপোয়া, গজা, নারকেল নাড়ু ইত্যাদি।

বিধান সরণির চন্দ্র বাড়ির পুজো

এই পুজোর ভোগ আর নৈবেদ্য দুটোই রীতিমতো তাক লাগিয়ে দেয়। প্রতি বছর নিয়ম করে পুজোর সময় এখানে ভিয়েন বসে। প্রতিদিন মা দুর্গাকে ১৭টি থালায় চাল, কলা আর মিষ্টি দিয়ে নৈবেদ্য দেওয়া হয়। ভোগের মধ্যে থাকে লুচি, আলুভাজা, নারকেল নাড়ু, রসবড়া, চন্দ্রপুলি সব। দশমীর দিন নিয়ম আছে মাছ কিনে রান্না করে খাওয়ার।

হাটখোলার দত্তবাড়ির পুজো

হাটখোলার দত্তবাড়ির পুজোতে যেমন চিনি বেটে তারপর রান্নায় দেওয়া হয়। ঘিয়ে ভাজা লুচি আর বাটা চিনি এই বাড়ির বিশেষ ভোগ।

লাহাবাড়ির পুজো

২১ রকমের তাক লাগানো মিষ্টি দেওয়া হয় লাহা বাড়িতে।

হালদারবাড়ির পুজো

এই বাড়ির এক বিশেষ 'পাঁচ পো' প্রথা। এর মানে হল এখানে চাল, ডাল, দুধ, নুন, তেল সব কিছুই থাকবে পাঁচ পো। যদি একচুলও কম বা বেশি হয় তাহলে সেই ভোগ আর দেবীকে দেওয়া যায় না।

উদ্যোগ—

ব্রিটিশদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যবসায় বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ রেখেছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর

মধুমিতা দাস

১৮২৫ থেকে ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়কালকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলে মনে করা হয়। এই সময় নতুন যুগের উত্তাল হওয়ার পরশে নতুনভাবে জেগে ওঠে মহানগর কলকাতা ও গোটা বঙ্গদেশ, জেগে ওঠে বঙ্গদেশের মফস্বল শহরগুলো। উনিশ শতকে বঙ্গদেশে যা ঘটেছিল তাকে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ বলা যায় কিনা তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এর স্রোতধারা বাঙালির তরুণ চিত্তে বিপুল স্বপ্ন সৃষ্টি করেছিল সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারেনি। ইতিহাসের এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে বাংলার বহু কৃতী সন্তানরা নতুন নতুন শিল্প উদ্যোগে ও তাঁদের মুক্তবুদ্ধি, স্বাধীন চিন্তায় চারিদিক আলোকিত করেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে প্রচলিত করার জন্য কলকাতায় অভিজাত পল্লিতে একের পর এক গড়ে ওঠে এজেন্সি হাউস। শিক্ষা ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে রাজনীতি, বিজ্ঞানচর্চা প্রতিটি ক্ষেত্রেই একাধিক উজ্জ্বল নক্ষত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে যিনি অন্যতম ছিলেন তিনি হলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪ - ১৮৪৬)। তিনি প্রথম হুগলি নদীর তীরে ইংল্যান্ডের মতো শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখেন।

ঠাকুর, প্রিন্স দ্বারকানাথ ছিলেন একাধারে উদ্যোক্তা এবং কলকাতার জোড়াসাঁকোর মহান ঠাকুর পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। সমসাময়িকরা তাঁকে রাজকুমার বলে ডাকতো। কারণ তিনি ব্রিটেনে গিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর সংস্পর্শে আসা লোকেরা তাঁকে প্রথম একজন রাজপুত্র হিসেবে বর্ণনা করেছিল। এছাড়াও কলকাতায় তাঁর জীবনধারা রাজকীয় মহিমা এবং প্রভাব দ্বারা চিহ্নিত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ, দ্বারকানাথ ছিলেন সেই 'বানিয়া' ও মুৎসুদ্দিদের (ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের এজেন্ট এবং অফিসার) একজন, যাঁরা প্রথম প্রজন্মের বাঙালি উদ্যোক্তা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তৈরি করেছিলেন। ঠাকুরদের মধ্যে তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি যশোরে নিজের পিতা-মাতার বাড়ি ছেড়ে ইউরোপীয়ানদের কাছে বেনিয়াদের পদে যোগদান করেছিলেন। সতেরো শতকের শেষের দিকে ফরাসিদের সঙ্গে বেনিয়া হিসাবে কাজও করেছিলেন।

বাংলার অন্যান্য সফল ব্রাহ্মণ পরিবারের মতো ঠাকুররাও কনৌজ থেকে রাজা আদিসুর দ্বারা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। সেই খাঁটি ব্রাহ্মণদের থেকে তাদের পূর্বপুরুষ বংশানুক্রমিক দাবি করে। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ গবেষকরা দাবি করেন, যে তারা পিরালি ব্রাহ্মণ নামে একটি স্থানীয় ও অধঃপতন ব্রাহ্মণ উপজাতির অন্তর্গত এবং উচ্চতর ব্রাহ্মণ বর্ণের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। যাইহোক, আধুনিক ঠাকুর পরিবারের (ঠাকুরের ইংরেজি রূপ) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন জয়রাম, যিনি ১৭৬০-৬২ সাল নাগাদ ২৪-পরগনার একজন আমিন, যাঁর চার পুত্র ছিল; যাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন নীলমণি ঠাকুর (মৃত্যু ১৭৯১)। তিনি চট্টগ্রাম জেলার সেরেস্তাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জয়রাম কর্তৃক নির্মিত পাথুরিয়াঘাটায় নীচু পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে তিনি যথেষ্ট বিত্তশালী হয়ে ওঠেন এবং জোড়াসাঁকোতে একটি নতুন বাড়ি নির্মাণ করেন যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

জন্ম ও বেড়ে ওঠা। নীলমণির ছেলে রামলোচন, একজন ধনী বনিয়ান। তিনি ব্যবসায়ী দ্বারকানাথকে দত্তক নিয়েছিলেন। পারিবারিক নাম ঠাকুর (প্রভু) বলে কথিত আছে। গোবিন্দপুর মাছধরা গ্রামের লোকেরা, যারা পিরালি ব্রাহ্মণদের আচার-অনুষ্ঠানে পরিবেশন করে বিশেষ সুবিধা পেয়েছিলেন বলে মনে করা হয়।

ব্রিটিশ আইনজীবী রবার্ট গুটলার ফার্গুসনের অধীনে দ্বারকানাথ একজন শিক্ষানবিশ হিসাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন এবং কলকাতার সুপ্রিম কোর্ট, সদর ও জেলা আদালতের আইন ও পদ্ধতিগুলি শিখেছিলেন। ১৮১৫ সালে খুব সফলভাবে তাঁর আইনি জীবন শুরু হয়। তিনি পিতা রামলোচনের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমিদারি সম্পত্তির প্রসার শুরু করেন। ১৮৩০ সালে দ্বারকানাথ রাজশাহী জেলার কালীগ্রাম জমিদারি এবং ১৮৩৪ সালে পাবনা জেলার শাহাজাদপুর নিলামে কিনে নেন। তাঁর জমিদারির অনেক অংশীদার ও সহ-ক্রেতা ছিল। কিন্তু দ্বারকানাথ চারটি বড়ো এস্টেট- বেরহামপুর, পাণ্ডুয়া, কালীগ্রাম এবং শাহাজাদপুর অংশীদার ছাড়াই ধারণ করেছিলেন এবং ১৮৪০ সালে তিনি সেগুলিকে নিজের পুত্র এবং তাঁদের বংশধরদের জন্য রেখেছিলেন। দ্বারকানাথের জমিদারি পরিচালনার অনন্য দিকটি ছিল, তিনি এটিকে সামন্তভাবে নয় বরং উদ্যোক্তা হিসেবে দেখতেন। তিনি এই সব এস্টেট পরিচালনার জন্য বেশ কিছু ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করেছিলেন।

দ্বারকানাথ শুল্ক, লবণ ও আফিম বোর্ডের অধীনে একজন সেরেস্তাদার (১৮২৮) এবং পরে দেওয়ান হিসেবে লাভজনক চাকরির মাধ্যমে নিজের ভাগ্য অর্জন করেন। তিনি বারো বছর দীউয়ান'এর দায়িত্ব পালন করেন। লবণ প্রস্তুতকারক এবং মহাজন হিসাবে ক্রেডিট মার্কেটেও যোগ দেন। অর্থঋণ দেওয়া ছাড়াও তিনি ম্যাকিনটোস অ্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে রপ্তানি বাণিজ্য করে মূলধন বাড়িয়েছিলেন। ১৮২৯ সালে যখন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সেখানে তাঁর শেয়ার ছিল। জমিদারি নিয়ন্ত্রণ সহ এইসব কোম্পানির বাণিজ্যিক বিভাগের সঙ্গে দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাজ চলত।

১৮৩৫ সালে সরকার দ্বারকানাথকে 'বিচারপতি অফ দ্য পিস' পদে সম্মানিত করে, যা ভারতীয়দের জন্য একটি সম্মানজনক পদ। ১৮৪০ সালের মধ্যে তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে উন্নতির শীর্ষে উঠতে পেরেছিলেন। শিপিং, রপ্তানি বাণিজ্য, বিমা, ব্যাঙ্কিং, কয়লা খনি, নীল, শহুরে রিয়েল এস্টেট এবং জমিদারি এস্টেটে তার বিনিয়োগ ছিল।

১৮৪০-এর দশকের গোড়ার দিকে ব্যবসায়িক মন্দা এবং

দ্বারকানাথ ঠাকুরের সদ্য অর্জিত রাজকীয় জীবনধারার ফলে তাঁর ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। অনেক লোক এবং কোম্পানির কাছে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

ইউরোপীয় এবং স্থানীয় বন্ধুদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে, দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর বন্ধু এবং দার্শনিক রাজা রামমোহন রায়ের মতো ব্রিটেনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৪২ সালের ৯ জানুয়ারি তিনি সুয়েজের উদ্দেশে নিজস্ব স্টিমার, 'ইন্ডিয়া'তে চড়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর ইউরোপীয়ান চিকিৎসক ম্যাকগোয়ান, তাঁর ভাগ্নে চন্দ্রমোহন চ্যাটার্জি, সহকারী ডি ক্যাম্প পরমানন্দ মৈত্র, তিনজন হিন্দু সেবক এবং একজন মুসলিম শেফ। লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রবার্ট পিল, বোর্ড অফ কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট লর্ড ফিটজেরাল্ড, প্রিন্স আলবার্ট, কেন্টের ডাচেস এবং রানি ভিক্টোরিয়া তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। দ্বারকানাথ ২৩ জুন রানির সৈন্যদের নিয়ে পর্যালোচনা করে কাটান। ৪ জুলাই, তাঁকে রানির সঙ্গে একটি নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। রানি তাঁর ডায়েরিতে পরে উল্লেখ করেছিলেন, 'ব্রাহ্মণ অসাধারণভাবে ইংরেজিতে কথা বলেন। তিনি খুব বুদ্ধিমান, আকর্ষণীয় মানুষ'।

দ্বারকানাথ তাঁর জমিতে রেশম, মশলা এবং নীল চাষ করতেন, সেগুলো রপ্তানি করতেন বিদেশে। ১৮১৩ সালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান ঘটে দ্বারকানাথের মতো উচ্চাভিলাষী ব্যবসায়ীদের জন্য।

বাণিজ্যে সাফল্য এবং তার এস্টেট থেকে লাভজনক রিটার্নের সঙ্গে দ্বারকানাথ বিমা এবং ব্যাঙ্কিং শিল্পে পা রাখেন। যা ভারতবাসীর কাছে ছিল প্রথম পদক্ষেপ। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ১৮২২ সালে 'ওরিয়েন্টাল লাইফ অ্যাসুরেন্স সোসাইটি', ব্রিটিশ বণিকদের অংশীদার হিসাবে। এই কোম্পানি বিশেষ ধনী ব্যক্তিদের জীবনবিমার পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের এবং তাঁদের সামুদ্রিক বিমার পথ বিস্তৃত করে।

একইভাবে, ১৮২৮ সালে, দ্বারকানাথ তাঁর ব্রিটিশ অংশীদারদের সঙ্গে 'দ্য ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' (এর সঙ্গে আজকের ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক সংযুক্ত নয়) প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রথম এই ব্যাঙ্কের পরিচালক হন। এটি ছিল ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলের মতো ব্রিটিশ মালিকানাধীন ব্যাঙ্কগুলির কাউন্টার, যা শুধুমাত্র ব্রিটিশ স্বার্থের পক্ষে ছিল। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ছিল ইন্দো-ব্রিটিশ এক বৃহত্তম যৌথ উদ্যোগ এবং দ্বারকানাথের জীবদ্দশায় বাণিজ্যিক উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর স্তম্ভ ছিল কলকাতায় বাণিজ্যিক কার্যক্রম। লেখক ও সংসদ সদস্য কৃষ্ণ কৃপলানি তাঁর বই 'দ্বারকানাথ ঠাকুর, আ ফরগটেন পাইওনিয়ার'এ লিখেছেন কীভাবে দ্বারকানাথ বাজপাখির মতো একজন চতুর ব্যবসায়ী ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৩৪ সালে, তিনি ব্রিটিশ বণিক উইলিয়াম কারের সঙ্গে অংশীদারিত্বে একটি কর্পোরেট সত্তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'কার, টেগোর কোম্পানি' ছিল তার নাম। এটা ছিল আধুনিক দিনের হোল্ডিং কোম্পানি। যা আসলে দ্বারকানাথের আরেকটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ। ভারতে প্রথম বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে চায়ের চাষ করে 'বেঙ্গল টি অ্যাসোসিয়েশন'। দ্বারকানাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কনসোর্টিয়াম হয়। ১৮৩৯ সালে এটি অসম কোম্পানি হয়। কোম্পানিটি আজও বিদ্যমান।

কারখানায় বাষ্প প্রযুক্তির প্রবর্তন

ব্রিটিশদের সঙ্গে যাঁর ব্যাপক যোগাযোগ ছিল, সেই দ্বারকানাথ দেখেছিলেন, কীভাবে বাষ্প প্রযুক্তি ইউরোপে শিল্পবিপ্লব ঘটিয়েছিল। তিনি স্বপ্ন দেখতেন বাষ্প ইঞ্জিন ভারতেও শিল্প বিপ্লব ঘটাবে। সেই জন্য তিনি ইংল্যান্ড থেকে বাষ্প ইঞ্জিন আমদানি করেছিলেন। তিনি জানতেন যে কলকাতা থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত একটি টাগিং সার্ভিস ছিল। একটি জাহাজ হুগলি নদীতে চলাচল করতে এক পাক্ষিক সময় নিত। একটি টাগবোট ২ দিনে এটি করতে পারে। ১৮৩০ সালে, দ্বারকানাথ প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতা স্টিম টাগ অ্যাসোসিয়েশন।

কয়লা খনি স্থাপন

যে বাষ্প ইঞ্জিনগুলো কয়লার ওপর নির্ভরশীল ছিল, সেই সব ইঞ্জিনের জন্য দ্বারকানাথ বাংলায় কয়লা খনি কিনেছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম রানিগঞ্জ কয়লা খনি, যা আজ কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের মালিকানাধীন।

রেলওয়ের জন্য পরিকল্পনা

কয়লাখনি অভিযান দ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্য আরেকটি বৈপ্লবিক ধারণা নিয়ে আসে। ১৮৪২ সালে লন্ডন সফরের সময় তিনি রেললাইন স্থাপন করার কথা চিন্তা করেন। রানিগঞ্জ ও কলকাতার মধ্যে কয়লা পরিবহণের জন্য এই ভাবনা। পরের বছর, তিনি প্রতিষ্ঠা করেন গ্রেট ওয়েস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অবশ্য এই অনুমতি প্রত্যাখ্যান করে।

কুরিয়ার সার্ভিস

দ্বারকানাথ প্রস্তাব দেন ডাক ও ক্যুরিয়ার সমুদ্রপথে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। প্রথম ধাপ হিসেবে সুয়েজের ইস্তমাস, তারপর ওভারল্যান্ড আলেকজান্দ্রিয়ায় এবং তারপর থেকে পাঠানো হয় আলেকজান্দ্রিয়া থেকে লন্ডন। মিশরীয়রা প্রস্তাবে রাজি হলেও ব্রিটিশ পূর্ব ভারত কোম্পানির পরিচালকরা অনুমতি প্রত্যাখ্যান করেন।

দুঃখজনকভাবে ১৮৪৬ সালে মাত্র ৫১ বছর বয়সে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হলে তাঁর ব্যবসায়িক দৌড় আকস্মিকভাবে শেষ হয়ে যায়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন। তাঁর পরে এই ব্যবসায়িক উদ্যোগ চালিয়ে যেতে পারে এমন কেউ আর ছিল না। দ্বারকানাথের সমস্ত ব্যবসা কোনওটা বন্ধ হয়ে যায়, কোনওটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশদের হাতে চলে যায়।

আজ আমরা দ্বারকানাথ ঠাকুরকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়ে চেনার চেষ্টা করি। কিন্তু বলতে বাধা নেই ব্রিটিশদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যবসায় বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ রেখে ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।

উদ্যোগ—

সৌরশক্তির ব্যবহার করে মাইক্রো লেভেলে উদ্যোগী গড়ে তুলতে চাই : অনুপম বড়াল

প্রায় চার দশক ধরে সৌরশক্তির ব্যবহার নিয়ে কাজ করে চলেছেন। কাজের স্বীকৃতির জন্য তিনবার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। এখন একটাই ধ্যান-জ্ঞান সৌরশক্তির ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন করা ও বাংলার বেকার ছেলে-মেয়েদের কাজের দিশা দেখানো। গীতাঞ্জলি সোলার এন্টারপ্রাইজের কর্ণধার **অনুপম বড়াল** নিজের মুখে তাঁর স্বপ্নের কথা জানালেন।

প্রশ্ন : সৌরশক্তির ব্যবসায় এই রাজ্যে আপনি কি প্রথম উদ্যোগী?

অনুপম বড়াল : সৌরশক্তি ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় সরকারের ৩টি সংস্থা কাজ করে- সিইএল, বিএইচইল, রিইআইএল। তবে বেসরকারি উদ্যোগে ভারতে সম্ভবত আমি প্রথম সোলার এনার্জির ব্যবসা শুরু করি। ওই সময় কোনো বাঙালি উদ্যোগীর মাথায় আসেনি সোলার এনার্জি নিয়ে ব্যবসা করা যায়।

প্রশ্ন : সোলার এনার্জি নিয়ে কত বছর ধরে কাজ চলছে?

অনুপম বড়াল : প্রায় চার দশক ধরে সৌর সরঞ্জাম উদ্ভাবন ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে সারা দেশ জুড়ে কাজ করছি।

প্রশ্ন : এটা নিয়ে ব্যবসা করার কথা কেন ভাবলেন?

অনুপম বড়াল : আমি বহরমপুরের ভূমিপুত্র। স্কুলে পড়ার সময় থেকে বহরমপুর বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে নানা ধরনের মডেল বানাতাম। সেসব বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে দেখাতাম। এরপর ডিগ্রি কোর্স পাশ করার পর ঠিক করি চাকরি নয়, ব্যবসা করে নিজের পায়ে দাঁড়াব। নতুন সম্ভাবনাময় ব্যবসার ক্ষেত্র হিসাবে সোলার এনার্জির কথা মাথায় আসে। কারণ তখনই মনে হয়েছিল আমাদের চিরাচরিত শক্তির উৎস ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, বিকল্প শক্তি হিসাবে সোলার এনার্জির ওপর ভরসা করতে হবে।

প্রশ্ন : তারপরের জার্নিটা?

অনুপম বড়াল : কারিগরি জ্ঞানের জন্য প্রথমে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ও পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সোলার এনার্জি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিলাম। এরপর অ্যাডভান্সড প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম আইআইটি দিল্লি থেকে। কারিগরি দক্ষতা অর্জন করলাম ঠিকই কিন্তু ব্যবসার ধারণাও থাকা দরকার। তার জন্য ডিএসটি-র আর্থিক সহযোগিতায় কলকাতার আইএসডব্লুবিএম থেকে ৬ মাসের বিজনেস ম্যানেজমেন্টের কোর্স করি।

প্রশ্ন : ব্যবসার জন্য মূলধন কোথায় পান?

অনুপম বড়াল : আমার মার কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা ধার নিয়ে '৮৪-৮৫ সাল নাগাদ সৌর সরঞ্জামের ব্যবসা শুর করি। এরপর সেন্ট্রাল ইলেকট্রনিক্স বিভাগ থেকে সোলার সেলের একটা ডিস্ট্রিবিউশন পাই। রাজ্যের জেলা শিল্পকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাগোগ করি ও তাদের মাধ্যমে ব্যবসা বাড়ানোর চেষ্টা করি। তখন বহরমপুর থেকে কলকাতায় যাতায়াত করতাম। আমার সমস্যা দেখে এক দাদু কলকাতার এজরা স্ট্রিটে আমার জন্য একটা টেবিল স্পেসের ব্যবস্থা করে দেন। নয়ের দশকের গোড়ায় দিল্লির প্রগতি ময়দানে আন্তর্জাতিক শিল্পমেলায় নিজের সোলার সামগ্রী নিয়ে যাই। সেখানে সোমনাথ চট্টোপ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে নিজের ভাবনা ও তার মাধ্যমে বাংলার উন্নয়নের কথা জানাই। সোমনাথবাবুর সাহায্যে কসবার শিল্পতালুকে নিজের ইউনিট করার জন্য জমি পাই। 'আইআরইডিএ' থেকে পৌনে ৩ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে গীতাঞ্জলি সোলার এন্টারপ্রাইজের প্রতিষ্ঠা করি। ১৯৯৩ সালে এই ইউনিট হয়। ১৯৯৪ সালে যার উদ্বোধন করেন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্রশ্ন : এখন ক'টা ইউনিট?

অনুপম বড়াল : ৪টে ইউনিট। কসবা শিল্পতালুকে ২টো, শিলিগুড়ির ডাবগ্রামে ১টা ও বহরমপুর শিল্পতালুকে ১টা। ৪টে ইউনিট চলে সরকারি শিল্পতালুকে।

প্রশ্ন : এই সব ইউনিটে কতজন কাজ করেন?

অনুপম বড়াল : প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্তত ৫০ জন লোক রয়েছে। আমার কাছে কাজ শিখে অন্তত ১০০-২০০ জন ছেলে-মেয়ে সোলার এনার্জির ব্যবসা করে স্বনির্ভর হয়েছেন।

প্রশ্ন : এই মুহূর্তে কী ধরনের কাজ করছেন?

অনুপম বড়াল : নতুন নতুন সোলার সরঞ্জাম যেমন তৈরি করছি, তেমনি ব্যস্ত রয়েছি অন-গ্রিড, অফ-গ্রিড ও হাই ব্রিড ইনস্টলেশন ও মেন্টেনেন্সের কাজে।

প্রশ্ন : সোলার এনার্জির ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ কেমন?

অনুপম বড়াল : সৌরশক্তি আমাদের ভবিষ্যৎ। এই শিল্প ঘিরে যেমন চাকরির সুযোগ রয়েছে তেমনি রয়েছে ব্যবসারও ভালো সুযোগ। দু'টোর সুযোগ রয়েছে মার্কেটিং, ইনস্টলেশন, সার্ভিসিং ও মেন্টেনেন্সের কাজে।

প্রশ্ন : কাজ করতে গেলে দক্ষতা লাগে, তার জন্য কী উদ্যোগ নিচ্ছেন?

অনুপম বড়াল : সৌর ব্যবস্থাপনায় চাকরি বা ব্যবসা করতে গেলে কারিগরি দক্ষতা থাকতে হয়। সোলার এনার্জির ক্ষেত্রে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার জন্য গীতাঞ্জলি সোলারের পক্ষ থেকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বাংলার বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য আমরা মাইক্রো লেভেলে উদ্যোগী গড়ে তোলায় সচেষ্ট হয়েছি।

সঙ্গীত—

সুরকারের ভূমিকায় অচেনা উত্তম

মহানায়ক উত্তমকুমার শুধু যে নিজে ভালো গান গাইতেন তা নয়, একাধিক বাংলা সিনেমায় তাঁর তৈরি করা সুরে বিখ্যাত সব গায়ক-গায়িকারা গান গেয়েছেন। তাঁদের গাওয়া সেই সব গান সুপারহিটও হয়েছে। সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে উত্তমকুমারের জীবনের নানা স্মরণীয় কাহিনির কথা শোনাচ্ছেন সবুজ সেন।

মহানায়ক উত্তমকুমারের অভিনয়, ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনেক আলোচনা, লেখালেখি হলেও বাঙালির গোলটেবিল বৈঠকে সুরকার বা সঙ্গীত পরিচালক উত্তমকুমার ব্রাত্যই থেকে গিয়েছেন। ছবিতে তাঁর সঙ্গীত পরিচালনা নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয়নি।

অভিনয়ের পাশাপাশি গানের টান

অভিনয়ের পাশাপাশি ছোটো থেকেই উত্তমকুমারের গানের প্রতি একটা টান ছিল। দক্ষিণ কলকাতার সাউথ সাবার্বান স্কুলে পড়ার সময় থেকে সাংস্কৃতিক অনু'ানে অংশ নিতেন। ভবানীপুরের গিরিশ মুখার্জি রোডের পৈতৃক বাড়িতে বসত গানের আসর। পরিচালক হৃষিকেশ মুখার্জির বাবা শীতল মুখার্জি সেখানে টপ্পা গাইতেন। ঘরোয়া আসরে সেই সব গান শুনে গানের প্রতি টান তৈরি হয় অরুণের (উত্তমকুমারের ডাকনাম)। পরে পোর্ট কমিশনের অফিসে চাকরির পাশাপাশি তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নেন নিদানবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। পরে উত্তমকুমার চক্রবেড়িয়া স্কুলের গানের শিক্ষক হন। আর এই গানের সূত্রেই অরুণের সঙ্গে প্রেম হয় গৌরীর। অরুণের বোন অন্নপূর্ণার গানের স্কুলের বন্ধু ছিলেন গৌরী। আর এই সূত্রে একদিন গৌরীদেবী উত্তমকুমারের বাড়িতে আসেন। তাঁর গলা শনতে পেয়ে অরুণ হারমোনিয়াম টেনে গলা সাধতে বসেন। যাতে গৌরীদেবী তাঁর গান শুনে ঘরে আসেন। কিন্তু গৌরী সেদিন ঘরে আসেননি। তবে বোন অন্নপূর্ণা এসে দাদাকে খবর দেন, 'গৌরী বলেছে তোর দাদার গলা বেশ সুন্দর তো'! জীবনের সেরা প্রশংসা ওইদিন পান অরুণ। তারপর একসময় অরুণ-গৌরীর চার হাত এক হয়।

গায়ক উত্তমকুমার

বাড়ির ঘরোয়া জলসা থেকে শুরু করে বসুশ্রী সিনেমা হলের পয়লা বৈশাখের জলসায় উত্তমকুমারের গান ছিল অন্যতম আকর্ষণ। একবার রবীন্দ্রসদনে এক অনু'ানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে উত্তম আর সুচিত্রা মঞ্চে বসে দর্শকদের সামনে ডুয়েট গান করেন।

আমরা প্রত্যেকেই আরতি মুখোপাধ্যায়ের গলায় 'এই মোম জোছনায় অঙ্গ ভিজিয়ে' গানটা শুনেছি। অথচ এই গানই উত্তমকুমার এক জলসায় গেয়েছিলেন। তা শুনে গানটি টেপ

করে রাখেন ওই সময়ের মেগাফোন কোম্পানির কর্ণধার কমল ঘোষ। পরে তা রেকর্ড হিসাবে বেরোয়। এখন ইউটিউবে উত্তমকুমারের গলায় ওই গান শুনতে পাওয়া যায়। পরে আরতি মুখোপাধ্যায় ওই গানটি গাওয়ার সময় সুরকার নচিকেতা ঘোষ কিছুটা বদল আনেন তাঁর গায়কীর কথা ভেবে। এই গানের গীতিকার ছিলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। উত্তমকুমার দেবকি বসুর 'নবজন্ম' ছবিতে নিজের লিপে গেয়েছিলেন। কিছু কিছু দৃশ্যে পাওয়া যায় তাঁর গলার গান।

সুরকার উত্তমকুমার

১৯৬৬ সালে উত্তমকুমারকে পাওয়া যায় সঙ্গীত পরিচালক ও সুরকার হিসাবে। ওই বছর মুক্তি পায় উত্তম-সুপ্রিয়া জুটির সাড়া জাগানো ছবি 'শুধু একটি বছর'। মুক্তি পায় আরও একটি ছবি 'কাল তুমি আলেয়া'। এই ছবিতে ধীরাপদর ভূমিকায় ছিলেন উত্তমকুমার আর সোনা বউদির চরিত্রে ছিলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। লাবণ্য সরকারের চরিত্রে ছিলেন সুপ্রিয়া দেবী। নিজের অভিনীত এই ছবিতে গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি করে সুর করেছিলেন উত্তমকুমার। ছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ছিল 'আমি চলে যাই'। এই গানটাই আর একবার সংলাপের সঙ্গে ছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নিজে এই গানের প্রশংসা করেন। আশা ভোঁসলের গলায় ছিল দুটো গান। 'মনের মানুষ ফিরল ঘরে একটু বেশি রাতে' আর 'পাতা কেটে চুল বেঁধে সে টায়রা পরেছে'। এই ছবিতে আশা ভোঁসলের গান গাওয়া নিয়ে কাহিনি রয়েছে। আশা ভোঁসলের গলা ও গায়কী খুব পছন্দ ছিল মহানায়কের। নিজের প্রথম সঙ্গীত পরিচালনায় তিনি আশা ভোঁসলেকে দিয়ে গান গাওয়াতে চান। তাঁর এই ইচ্ছের কথাটা গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানান। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উত্তমকুমার 'মামা' বলে ডাকতেন। গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় যোগাযোগ করেন আশা ভোঁসলের সঙ্গে। নির্দিষ্ট দিনে উত্তমকুমার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় যান আশা ভোঁসলের বাড়ি। এই ব্যাপারে গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আশা অভিনেতা ও নায়ক উত্তমকুমারের এক স্বপ্নমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন, কিন্তু সুরকার হিসাবে উত্তমের কথা জেনে রীতিমতো অবাক হন আর যথেষ্ট সংশয়েও ছিলেন। তাঁর হাবভাব ছিল নেতিবাচক। সেই কারণে যখন উত্তমকুমারের সুরে বাংলা ছবিতে গান গাওয়ার প্রস্তাব পান তখন তিনি একটাই শর্ত রাখেন, মুম্বইয়ে তাঁর বাড়িতে এসে গান শোনাতে হবে। আশা ভেবেছিলেন, না জানি কেমন সুরকার হবেন উত্তমকুমার! কিন্তু ওইদিন সুরকার উত্তমকুমার আশা ভোঁসলেকে বিস্মিত করেন। প্রথম থেকে পেশাদার সুরকাররা যেভাবে গান তোলান ঠিক সেভাবেই আশা ভোঁসলেকে গান তোলান উত্তম। একটার পর একটা গান গাইতে গাইতে গানের পিছনের দৃশ্যের নাটকীয়তা যেভাবে থাকবে তাও বোঝাতে থাকেন আশাকে। একসময় গান তোলানোর কাজ শেষ হয়। মুগ্ধ আশা ভোঁসলে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন উত্তমকুমারের দিকে। আশার বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে উত্তম বলেন, সব যখন হল তখন আর নোটেশন কেন বাকি থাকে। সুরকার উত্তমকুমার তখনই গানের তলায় নোটেশন লিখে দেন। যা গায়িকা আশা ভোঁসলেকেও আরো অবাক করেছিল'। আসলে উত্তমকুমারের রাগসঙ্গীতে যে দক্ষতা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, 'কাল তুমি আলেয়া' ছবিটি টানা ১৪ সপ্তাহ চলে।

ঠিক তার ১০ বছর পর মুক্তি পায় অসীম সরকার প্রযোজিত ও পীযূষ বসু পরিচালিত 'সব্যসাচী'। এই ছবিতে মুখ্য চরিত্র ছাড়াও সুরকারের দায়িত্ব পালন করেন উত্তমকুমার। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় তৈরি এই ছবিতে সুরকার উত্তমকুমার রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কালজয়ী গান ব্যবহার করেন। ছবিতে সুরকার উত্তমকুমারকে সাহায্য করেন তাঁর শিক্ষক নিদানবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৭৩ সালে মুক্তি পায় শিল্পী সংসদের ছবি 'বনপলাশীর পদাবলী'। ছবির চিত্রনাট্যকার, পরিচালক ছাড়াও আবহসঙ্গীতের দায়িত্বে ছিলেন উত্তমকুমার। এই ছবিতে ৫জন সুরকার ছিলেন। নচিকেতা ঘোষ, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, অধীর বাগচি, শ্যামল মিত্র ও সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। যা এক বিরল ঘটনা। ছবিতে সুরকার হিসাবে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে আসেন উত্তমকুমার। এর আগে সতীনাথ বাংলা বেসিক গানে সুর করতেন। কিন্তু উত্তমকুমারের প্রস্তাব তিনি ফেরাতে পারেননি।

'বনপলাশীর পদাবলী' ছবিতে সতীনাথ দুটি গানের সুর দেন। সুর নিয়ে এক মজাদার গল্প রয়েছে। এক রবিবার সতীনাথ, উৎপলা সেন, মিউজিশিয়ানরা ও উত্তমকুমার সবাই হাজির টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োয়। ঠিক ছিল ওইদিন ছবির দুটো গান রেকর্ডিং হবে। উৎপলা সেনের গলায়, 'বহুদিন পরে ভ্রমর এসেছে পদ্মবনে' আর সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গলায় 'এই ভবের খেলা'। স্টুডিয়োতে সবাই অপেক্ষা করছেন রেকর্ডিস্ট সত্যেন চ্যাটার্জি আসবেন বলে। তখন খবর এল উনি অসুস্থ। ফলে সেদিনের রেকর্ডিং বাতিল করতে হবে। সতীনাথ মুখোপাধ্যায় তখন গানের সব নোটেশন তুলে ফেলেছেন। আচমকা উত্তমকুমার বলে ওঠেন, সতীনাথদা, আপনি সব রেডি করুন। আজ রেকর্ডিং হবেই। আমি সব ব্যবস্থা করছি'। প্রথমে উৎপলা গাইবেন, তারপর সতীনাথ। সবাইকে চমকে দিয়ে উত্তমকুমার বলেন, 'উৎপলাদি রেকর্ডিস্ট রেডি, তুমি নিশ্চিন্তে গান শুরু করে দাও'। তখন সবার চোখ স্থির! দেখা গেল রেকর্ডিস্ট-এর আসনে বসে স্বয়ং মহানায়ক!

কাজী নজরুল ইসলাম গোছানো মানুষ ছিলেন না

রামানুজ দাশগুপ্ত, নজরুলগীতির শিল্পী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম দু'জনই ছিলেন সঙ্গীতের সাধক। বাংলা সংস্কৃতিতে তাঁদের অবদান চিরস্মরণীয়। দু'জনের মধ্যে কোনও তুলনা চলে না। কিন্তু প্রশ্ন আসে রবীন্দ্রসঙ্গীত মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেলেও নজরুলগীতি কেন বেশি জনপ্রিয়তা পেল না? সাধারণের গান হয়ে উঠতে পারল না? সমস্যা কোথায়? একজন সঙ্গীতশিল্পীর দৃষ্টিকোণ নিয়ে বিচার করতে চাই। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। ছিলেন তাঁর গানের প্রতি বিশেষ যত্নবান। নিজের লেখা গানে নিজে সুর করেন, গানের স্বরলিপি তৈরি করেন যা লিপিবদ্ধও হয়। তাঁর গানের তদারকির জন্য ছিলেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর ইন্দিরা দেবীচৌধুরানিদের মতো মানুষরা। সর্বোপরি ছিল বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠান যা এখনো রয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখানোর দুটো বিশ্ববিদ্যালয় সহ একাধিক নির্ভরযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। অনেক গুণী গায়ক-গায়িকা তাঁর গানের ধারা সমানভাবে বজায় রেখেছেন। সিনেমায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার করা গানকে আরো বেশি করে সবার মাঝে পৌঁছে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর গানের ব্যাপক প্রচার হয় সরকারি ও বেসরকারি দুই উদ্যোগেই।

অন্যদিকে, কাজী নজরুল ইসলাম খুব বেশি গোছানো মানুষ ছিলেন না, বেশ উদাসীন মানুষই ছিলেন। পেশার তাগিদে একাধিক গানের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। তাদের ফরমায়েশ মতো একদিনে একাধিক গান লিখতেন। আবার দুই লাইন লিখে ছিঁড়ে ফেলতেন। সেসব অন্যরা নিজের নামে চালাতেন। তাঁর গানের লিপিবদ্ধ কোনো স্বরলিপি ছিল না। তাছাড়া ১৯৪২ সালে কবির বাকরুদ্ধ অবস্থা হয়, তারপর থেকে সব কিছু যে যার ইচ্ছেমতো চালান। গত শতকের ছয়ের দশকের পর থেকে নজরুলের গান নজরুলগীতি হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ১৯৬৩-৬৪ সালে নজরুল ইসলামের অন্যতম সহকারি কমল দাশগুপ্তর তত্ত্বাবধানে গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে নজরুলের গানের দুটো এলপি রেকর্ড বেরোয়। যেখানে জনপ্রিয় সব গায়ক-গায়িকাদের গাওয়া চব্বিশটি গান ছিল, এটা খুব জনপ্রিয় হয়। মূলত, তার পর থেকে নজরুলের গানের একটা জোয়ার দেখা যায়। এই ধারা চলে নয়ের দশক পর্যন্ত। কিন্তু সমস্যা হল, নজরুলের গানের কোনো লিপিবদ্ধ স্বরলিপি না থাকায় অনেকে ইচ্ছেমতো গাইতে শুরু করেন। তাতে সমস্যা হয়। কোনও কোনও শিল্পীদের গাওয়া নজরুল গীতি তাদের গান হয়ে ওঠে। এটা নিয়ে বিতর্ক দেখা যায়। বাংলাদেশের শিল্পীরা এদেশে এসে মূল স্বরলিপির গান গাইলে সমস্যা আরো বেড়ে যায়। নজরুলগীতির আরো একটা বড়ো সমস্যা, সঠিক শিক্ষক ও শিক্ষার অভাব। একবার ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র লিখেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথের গান তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ-সরল, খুব বেশি কায়দা-কানুন নেই, অন্যদিকে নজরুলের গানে রয়েছে নানা রাগ-রাগিনীর মিশ্রণ যা চর্চা না করলে গাওয়া যায় না।

আমার মতে, নজরুলগীতির জনপ্রিয়তা না পাওয়ার অন্যতম কারণ, সঠিক প্রচার, শিক্ষা ও শিক্ষক। দরকার আরো বেশি চর্চার।

শিক্ষা—

বাংলার যুবদের কাজের দিশা দেখাচ্ছে পিআইএমটি

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শিক্ষা ইউনিট প্রণবানন্দ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলার যুবদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজের দিশা দেখাচ্ছে। গুরু মহারাজ স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের আশীর্বাদ নিয়ে ২০০৮ সালে মাত্র দু'জন শিক্ষার্থী নিয়ে পথচলা শুরু হয় প্রণবানন্দ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজির। গত কয়েকবছরে এখান থেকে ২৫ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। কর্মমুখী পেশাদার কোর্স করে শিক্ষার্থীরা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। অনেকে ব্যবসা করে নিজেরা যেমন স্বনির্ভর হয়েছে তেমনই অন্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। সারা রাজ্য জুড়ে সংস্থার ১০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত কোর্সের পাশাপাশি সরকারি নানা প্রকল্পের কর্মসূচি চলে সারা বছর জুড়ে।

এখন এই সংস্থায় নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি স্বীকৃত বিভিন্ন 'কর্মমুখী' পেশাদার সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও অ্যাডভান্সড কোর্স পড়ানো হচ্ছে। নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত যে ১০টি কোর্স পড়ানো হয় তার মধ্যে রয়েছে, নেচারোপ্যাথি ও যোগা এডুকেশন, টেলারিং ও ড্রেস ডিজাইনিং, প্রি-প্রাইমারি মন্তেশ্বরী, ফায়ার সেফটি ও সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট, ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, ফিটনেস ও স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট, বিউটিশিয়ান ও হেয়ার ড্রেসিং, ই-অ্যাকাউন্টিং, ট্যাক্স, জিএসটি ও সোলার টেকনিশিয়ান। কোর্স অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি কোর্স পাশ। কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস, ১ বছর ও ২ বছর। অন্যদিকে, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি অনুমোদিত এই ৬টি পেশাদার কোর্স পড়ানো হয়- ফিজিওথেরাপি টেকনোলজি, আই (ভিশন) টেকনিশিয়ান, হেলথকেয়ার টেকনোলজি ও ম্যানেজমেন্ট, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, নেচারোপ্যাথি ওয়েলনেস থেরাপি ম্যানেজমেন্ট, ফ্যাশন টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট। কোর্সের মেয়াদ ২ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক।

এছাড়াও এখানে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয়। যে কোনো শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশ পড়ুয়ারা এখানে ভরতি হতে পারেন। এই কোর্সে স্পেশালাইজেশন বিষয় হিসাবে পড়ানো হয় অফিস/ রিটেল/ হিউম্যান রিসোর্স/ ট্রাভেল ট্যুরিজম/ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট/ লজিস্টিক্স/ ব্যাঙ্কিং ইন্সিওরেন্স/ সেফটি সিকিউরিটি/ ইনফর্মেশন টেকনোলজি/ ডাটা ও ডিজিটাল মার্কেটিং।

পিআইএমটি- ভারত স্কিল প্রকল্পের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় — টেলারিং ড্রেস ডিজাইনিং, বিউটিশিয়ান ও ওয়েলনেস, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও মেন্টেনেন্স, ল্যাপটপ সার্ভিসিং ও মেন্টেনেন্স, ফুড প্রিজারভেশন, হ্যান্ডিক্র্যাফটস। যে কোনো বয়সের ও শিক্ষাগত যোগ্যতার ছেলে-মেয়েরা এই সব কোর্স করতে পারেন।

প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যে সব কেন্দ্রে

কলকাতা, ডায়মন্ড হারবার, বর্ধমান, রায়গঞ্জ, হৃদয়পুর, বারাসাত, খাতরা, বাঁকুড়া, ফারাক্কা, মালদহ, বনগাঁ, কল্যাণী।

পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার নিগম, পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট, ভারত সরকারের এমএসএমই, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন, জেলা শিল্প কেন্দ্র, সিডবি, ন্যাবার্ড, জাতীয় ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বছরের বিভিন্ন সময়ে স্বনির্ভর কর্মসূচি ও কর্মশালা হয়। পিআইএমটি-র অধিকর্তা অধ্যাপক প্রবীরকুমার দে জানান, 'আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছেলে-মেয়েদের কর্মসংস্থানের পথ দেখাতে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে আমরা কাজ করে চলেছি। বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত এই সব কর্মমুখী কোর্স করে সরকারি ও বেসরকারি সব ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ রয়েছে। তবে সবসময় আমরা ছেলে-মেয়েদের স্বনিযুক্তির ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে থাকি। যাতে একজনের মাধ্যমে আরো ৫ জনের কাজের সুযোগ তৈরি হয়। ব্যবসা করার ক্ষেত্রে সব ধরনের সাহায্য দেওয়া হয়। যেমন, ব্যবসার প্রকল্প তৈরি, কাঁচামাল কোথায় পাওয়া যায়, কীভাবে পণ্য বিক্রি করতে হবে, কোথায় বাজার, মূলধনের জন্য কী কী সরকারি প্রকল্প রয়েছে, পাশাপাশি ব্যবসা করার জন্য প্রযুক্তিগত পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রতি মাসে পিআইএমটি-র উদ্যোগে কেরিয়ার ভিত্তিক সেমিনার হয়। যার মাধ্যমে ছেলে-মেয়েরা বুঝতে পারেন কেরিয়ারের নানা অপশন। এখন কেরিয়ারের নতুন নতুন দিক খুলে যাচ্ছে, নিজেকে সেভাবে তৈরি করতে হবে। নিজেকে সবসময় আপডেট রাখতে হবে।'

যোগাযোগ— ৯৪৭৭৮৪৬৫২০, ৯৩৩১২৫৬৯৩৪, ওয়েবসাইট - www.pimtonline.in

বাণিজ্য শাখায় উজ্জ্বল কেরিয়ার গড়তে প্রফেশনাল কর্মাস এডুকেশন

গত কয়েক বছরে গোটা বিশ্বের শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। এক্ষেত্রে অতিমারি একটা অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছে ঠিকই। কিন্তু যখন থেকে আর্থিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন ও বেসরকারিকরণ শুরু হয়েছে, তখন থেকে কর্মাস ও ই-কমার্স বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ব্যবসার পরিবেশ দ্রুত বদলে যাওয়া ও কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে একেবারে স্কুল স্তর থেকেই কমার্স ও ই-কমার্স দরকারি। এই বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার। কারণ প্রতিটি বাণিজ্যিক কাজে কমার্স ও ই-কমার্স-এর প্রয়োগ হয়। আজকের দিনে লোকের মুখে মুখে ইএমআই, ই-পারচেস, ই-সেল, ই-ট্রেড, ই-পেমেন্ট এই কথাগুলো শোনা যায়। কিছুদিন আগেও লোকে ফ্লিপকার্ড, ওলা, অ্যামাজনের নাম শোনেনি। আর এখন সবাই ওই সব ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে জিনিসপত্র কেনাকাটা করে। গোটা দুনিয়া এখন হাতের মুঠোয়বন্দি। আর্থিক ক্ষেত্রে ভারত যথেষ্ট 'ডায়নামিক', নতুন প্রজন্মের অর্থনীতিবিদরা এগিয়ে আসছেন। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে আনতে হবে গতিশীলতা। জাতীয় শিক্ষানীতিতে 'অ্যাপ্লায়েড এডুকেশন'-র ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। গোটা দুনিয়া যেখানে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে, সেখানে স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রম এখনও সাবেকিয়ানায় বন্দি। বিশেষ করে স্কুল-কলেজের বাণিজ্য শাখা, যা এখনো শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষায় বন্দি। শিক্ষার্থীদের শেখানো হয় না ব্যবহারিক দিক। ফলে, কাজের ক্ষেত্র ও লেখাপড়ার মধ্যে একটা দূরত্ব রয়ে গেছে। কাজের ক্ষেত্রে দেখা হয় কর্মপ্রার্থী কতটা দক্ষ। ব্যবহারিক জ্ঞান কতটা প্রয়োগ করতে পারেন। চাকরি পাওয়ার জন্য দরকার হয় পেশাগত দক্ষতা। পুরো বিষয়টা সমীক্ষা করে Glides Fintellect Private Limted বাণিজ্যশাখার শিক্ষার্থীদের জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। যেখানে রয়েছে কমার্স-র 'কোয়ালিটি এডুকেশন, এন্টারপ্রেনিওরশিপ ও রিসার্চ। পুরো বিষয়টার মধ্যে রয়েছে ইনোভেটিভ ভাবনা। যার একটাই লক্ষ্য, বাণিজ্যশাখায় দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা। প্রশিক্ষণের পর শিক্ষার্থীদের কাজের জন্য দক্ষ করে তোলা, কাজের সুযোগ করে দেওয়া। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে কমার্স শুধুমাত্র একটা বিষয় বা ব্যবসা নয়, নতুন প্রজন্মের জীবন গড়ার একটা পথ। সংস্থার অধিকর্তা সিএমএ গৌরবন্ধু গুপ্ত-র মুখোমুখি হয়ে জানা গেল-

প্রশ্ন : কেন শিক্ষার্থীরা গ্লিডস'কে বেছে নেবেন?

গৌরবন্ধু গুপ্ত : পেশাদার শিক্ষক ও প্রযুক্তির প্রয়োগে কমার্স শিক্ষায় আনা হয়েছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। যেখানে থিওরি শেখার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা হাতে-কলমে তার প্রয়োগের বিষয়টা শিখতে পারছেন।

প্রশ্ন : এখানকার শিক্ষক ও ফ্যাকাল্টিরা কি সবাই পেশাদার?

গৌরবন্ধু গুপ্ত : একদমই তাই। ফ্যাকাল্টিরা সবাই পেশাদার জগতের। যেমন, কেউ চ্যাডার্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বা কোম্পানি সেক্রেটারি। ম্যাথমেটিক্স ও ইংলিশের ফ্যাকাল্টিরা প্রিমিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের প্রাক্তনী বা শিক্ষকতার ক্ষেত্রে ১০ বছরের বেশি কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

প্রশ্ন : কী ধরনের কোর্স পড়ানো হয়?

গৌরবন্ধু গুপ্ত : প্রফেশনাল কমার্স এডুকেশনের ক্লাস করানো হয়। সীমিত খরচে একই ছাতার নীচে সিবিএসই/ আইসিএসই বোর্ডের কমার্সের ছাত্রছাত্রীদের অনলাইন/ অফলাইনে প্রফেশনাল টিউটোরিয়াল হয়। পড়ানো হয় ট্যাব বেসড মোডে।

প্রশ্ন : এখানে সিবিএসই/ আইসিএসই সব বিষয়ের কোচিং

দেওয়া হয়?

গৌরবন্ধু গুপ্ত : হ্যাঁ, সব বিষয়ের কোচিং হয়।

প্রশ্ন : ভর্তির জন্য কোনো পরীক্ষা দিতে হয়?

গৌরবন্ধু গুপ্ত : আমরা অফলাইন ক্লাস করাই উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা ও আসানসোলে। অনলাইন টেস্টের মাধ্যমে ভরতি নেওয়া হয়। কিন্তু অনলাইন ও ট্যাব বেসড কনটেন্টের জন্য ভর্তির পরীক্ষায় বসতে হবে না।

প্রশ্ন : কতজন করে ভরতি নেওয়া হয়?

গৌরবন্ধু গুপ্ত : অফলাইন ক্লাসে ব্যাচ প্রতি ছাত্র সংখ্যা সর্বোচ্চ ২৫জন।

প্রশ্ন : স্কুল স্তর থেকেই কি প্রফেশনাল কমার্স শিক্ষার দরকার?

গৌরবন্ধু গুপ্ত : দিন দিন কমার্সের নানা ক্ষেত্রে কাজের নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ওই সবক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের গ্রুমিং করার জন্য প্রফেশনাল কমার্স এডুকেশন দরকার। ফোকাস করা হচ্ছে প্র্যাক্টিক্যাল অ্যাপ্রোচ ও প্রফেশনাল কমপিটেন্সিতে।

প্রশ্ন : কেন Glides অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম থেকে আলাদা?

গৌরবন্ধু গুপ্ত : Glides প্রিমিয়ার প্রতিষ্ঠান যারা ভারতে প্রফেশনাল কমার্স টিচিং চালু করেছে। এই কার্যক্রম তাদের কথা ভেবে তৈরি করা হয়েছে যারা আগামী দিনে জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা দিতে চলেছেন ও পরে কমার্স নিয়ে উজ্জ্বল কেরিয়ার গড়তে চায়। এখানে শিক্ষার্থীদের পেশাদারি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি রয়েছে কেরিয়ার কাউন্সেলিং, পেরেন্টস সেকশন, প্রোগ্রেস ড্যাসবোর্ড, মোটিভেশনাল ক্লাস। যুবদের উন্নতি তথা বৃহত্তর সমাজের উন্নতির জন্য আমাদের এই প্রয়াস। যোগাযোগ- Glides Fintellect Private Limted, ৩১৯, Sentrum Office Block, Shristinagar, Asansol, Phone - ৮৯১৮৬১০২৮০

হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিত্ব

বিস্মৃত কবি রাধারানি দেবী

প্রথম বাধাটা এসেছিল নিজের বাপেরবাড়ি থেকে। এশিয়াটিক ফ্লু নামের মারণব্যাধি কেড়েছিল স্বামী সত্যেন্দ্রনাথের জীবন। তখন বয়স মাত্র তেরো বছর আট মাস। এয়ো'র চিহ্ন মুছে যায়। খাওয়া দাওয়া থেকে পোশাকে অনেকটা বদলে যায় অভ্যস্ত জীবনের ছন্দ। তবু শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়, পরিজন বিশেষত শাশুড়ি মা সুশীলাবালার স্নেহছায়া বাস্তবের রুক্ষতা থেকে অনেকখানি আড়াল করেছিল অকাল বিধবাকে।

খাদ্য হিসেবে বরাদ্দ হয়েছিল হবিষ্যান্ন, একাদশীতে নির্জলা উপবাস। এরপরের ইতিহাস মরা গাছে ফুল ফোটানোর, অনুপ্রেরণার আরেক নাম কবি রাধারানি দেবী, তিনি নবনীতা দেবসেনের জননী।

বিধবা কন্যার মা নারায়ণীদেবী ছেলে ও এক জামাইকে পাঠালেন শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়েকে ফিরিয়ে আনার জন্য। বললেন, তাঁর মেয়ের দ্বিতীয় বিয়ে হতে পারে না। তাহলে তারা সমাজের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। শাশুড়ি মা সুশীলাবালা দত্ত ঠিক করলেন, ফের বৌমার বিয়ে দেবেন। কিন্তু রাধারানির মা নারায়ণী সেকেলে মানুষ। সুশীলাবালা প্রতিবাদে করলেও পরিস্থিতির চাপে পুত্রবধূকে ফিরিয়ে দিলেন।

মাথাভাঙায় বাপেরবাড়ি এসে কন্যা বুঝল বৈধব্যের শুদ্ধাচার, নিয়মনিষ্ঠা কাকে বলে। থান পরানো হল, খুলে দেওয়া হল গায়ের গয়না, ছেঁটে দেওয়া হল মাথার কালো চুল। খাদ্য হিসেবে বরাদ্দ হল হবিষ্যান্ন, একাদশীতে নির্জলা উপবাস। কিছুদিন পরে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে এলেও মা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন, রঙিন শাড়ি আর আমিষ আহার চলবে না। সে কথা জেনে কষ্ট পেলেন শাশুড়ি সুশীলাবালা। কিন্তু হাল ছাড়লেন না তিনি। আদরের বৌমার গায়ে ফের উঠল ইঞ্চিপাড় কাপড়, হাতে দু'গাছি চুড়ি, গলায় কানে সোনা। রাধারানিকে তিনি দিলেন বড়ো ছেলের সম্মান!

মরা গাছে ফুল ফোটানোর চ্যালেঞ্জ রাধারানি নিয়েছিলেন। তাঁর গোটা জীবন যেন নাটক আর গল্পে মোড়া। সে তখন অন্তঃপুরিকা। সাহিত্য চর্চা আর নিয়মিত পড়াশোনা করে দিন কাটে। খাতার পর খাতা ভরিয়ে তোলেন। তাঁর লেখা প্রকাশের নেপথ্যের কাহিনি বেশ ইন্টারেস্টিং। আশুতোষ দত্ত ততদিনে কোচবিহার ছেড়ে কলকাতায় এসেছেন। বাড়িতে ফিরেছে সাহিত্য মনস্কতার পরিবেশ। এই সময় রাধারানির

ছোটো পিসিমা চমৎকারিনী দেবী দেবরপুত্র নরেন্দ্র দেবকে দিয়ে তাঁর ভাইঝির কবিতা প্রতিভা যাচাই করতে চাইলেন। সেই কবিতা পড়ে সাহিত্য জগতের প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী নরেন্দ্র হতবাক। নিজের জবানিতে লিখেছেন, 'আমি কবিতা পড়ে অবাক হয়ে গেলুম'। নরেন্দ্রর উদ্যোগে রাধারানির কবিতা প্রকাশ হতে লাগল।

রাধারানি কেন অপরাজিতা হলেন, কেন অপরাজিতাকে বারো বছর অজ্ঞাতবাসে রাখলেন সে কথা জানা যায় তাঁর লেখা একটি চিঠি থেকে। অপরাজিতার কবিতায় যাঁরা তাঁকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কবিগুরু রাধারানিকে ডেকে পাঠিয়ে প্রশ্ন করেছেন। তখন রাধু

বলেছেন, 'আপনার কাছে সত্য কথাই বলছি এই কবিতা পুরুষের রচনা নয়। মেয়েরই, হাতের রচনা.....অপরাজিতা তাঁর আসল নাম নয়, ছদ্ম নাম। সময় হলেই সে আপনার সামনে এসে পরিচয় দিয়ে আপনাকে প্রণাম করে ধন্য হবে। এখন তাঁর আসার উপায় নেই'।

সাহিত্য জগতের কিছু অবিচারের বিরুদ্ধে রাধারানির মনে যে প্রতিবাদ শানিত হচ্ছিল তার নান্দনিক প্রকাশ সম্ভব হয় 'অপরাজিতা' নামের দ্বিতীয় সত্তার সযত্ন নির্মাণে। সেই নির্মাণ এতটাই কুশলী যে ভাষাপ্রয়োগ, রচনাশৈলী, বিষয় নির্বাচনের পাশাপাশি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছাঁচের হাতের লেখা আয়ত্ব করেছিলেন

রাধারানি, অপরাজিতা দেবী নামে প্রকাশিত কাব্যের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার জন্য।

কবি নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে রাধারানির কবে প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছিল তার দিনক্ষণ জানা নেই, তবে কাব্য-দীপালির প্রথম সংস্করণ সম্পাদনার সময় রাধারানি দত্ত নরেন্দ্র দেবকে সাহায্য করেছিলেন। এটি প্রকাশিত হয় ১৯২৭সালে। এর চার বছর পরে দৈনিক বঙ্গবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় চাঞ্চল্যকর সংবাদ, শিরোনাম; 'রাধারাণী-নরেন্দ্র বিবাহ, কন্যার অস্মসম্প্রদান'। সাহিত্য জগত শুধু নয় সেদিন আলোড়ন উঠেছিল সমাজে। বিংশ শতকের তিনের দশকে বাল্যবিধবার পুনর্বিবাহ যথেষ্ট

চর্চার বিষয়। আর যার সঙ্গে বিয়ে হল তিনি বিপত্নীক নন।

রাধারানি বিয়ের দিন লিলুয়ায় এসেছিলেন তাঁর প্রথম শ্বশুরবাড়ি থেকে। কাউকে কিছু বলেননি। এই না বলে আসার অপরাধবোধে দীর্ণ হয়েছেন আমৃত্যু। মনে মনে মাকে কষ্ট পেতে দেখে কন্যা নবনীতা মাকে প্রশ্ন করেছিলেন, কেন তিনি এই কাজ করেছিলেন? যাঁরা তাঁকে এত স্বাধীনতা দিয়েছে, এমনকী নিজেরাই আবার তাঁর বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন! রাধারানি মেয়েকে বলেছিলেন, 'আমার ওপর গোটা পরিবারের

নির্ভরতা বেড়েছিল। এই সময়ে বিয়ের কথা জানালে যদি ওদের খারাপ লাগত'! হয়তো তিনি বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। তাই না জানিয়ে চলে এসেছিলেন।

১৯৩৪, বিয়ের তিন বছর পরে নরেন্দ্রর মা মৃণালিনী আছেন তাঁদের দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে। রাধারানি তখন সন্তানসম্ভবা। হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা সেই বাড়িতে হাজির সুশীলাবালা। ঘোর লজ্জায় রাধারানি, তাঁকে বুকে টেনে পরিস্থিতি সহজ করে দিলেন সুশীলাবালাই। ছেলে হয়েছিল তবে রইল না বেশিদিন। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সে চলে গেল মায়ের কোল শূন্য করে। তবে কি মা হওয়া তাঁর ভাগ্যে নেই! স্বামী নরেন্দ্র রাধারানির শরীরের অবস্থায় চিন্তিত। দুর্বল শরীরে হাঁপানির প্রকোপ বেড়েছে। শেষ পর্যন্ত ধন্বন্তরী চিকিৎসক শ্যামাদাস বাচস্পতি তাঁকে সুস্থ করলেন। পরামর্শ দিলেন, হাওয়া-বাতাস খেলে এমন বাড়িতে থাকার। এরপর সম্পূর্ণ নিজের তৈরি

নকশায় রাধারানির জন্য তৈরি হল বাড়ি। নাম 'ভালো-বাসা'। সত্যিই সুস্থ হয়ে উঠলেন রাধারানি, মনের মতো করে সাজিয়ে তুললেন তাঁদের স্বপ্ননীড় 'ভালো-বাসা'। ততদিনে সাহিত্য ও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। আত্মীয় পরিজনরা সবাই তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন তাঁরা আর দূরে থাকতে

পারলেন না। রাধারানির প্রথম শ্বশুরবাড়ির লোকরা যাতায়াত শুরু করলেন 'ভালো-বাসা'য়।

১৯৩৭ সালে আবার সন্তানসম্ভবা হলেন, ১৯৩৮ সালের ১৩ জানুয়ারি ওই বাড়িতে এল নতুন এক প্রাণ, রবীন্দ্রনাথ নামকরণ করলেন 'নবনীতা'। সেই মেয়েও পরবর্তীকালে হয়ে উঠলেন বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যাঁকে মানুষ চেনে নবনীতা দেবসেন নামে।

পথের পাঁচালীর ইন্দির ঠাকরুন 'চুনীবালা দেবী'

সত্যজিৎ রায়ের আবিষ্কার চুনীবালা দেবী; সত্যজিৎ রায়ের নিজের কথা, উত্তমকুমার না থাকলে যেমন 'নায়ক' সিনেমা করতেন না, তেমনি চুনিবালা দেবী না থাকলে

'পথের পাঁচালী' করা সম্ভব হত না।

সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী'র ইন্দির ঠাকরুন এর ভূমিকায় অভিনেত্রী চুনীবালা দেবী হলেন আন্তর্জাতিক

খ্যাতিসম্পন্না প্রথম ভারতীয় অভিনেত্রী। এ খবর সম্ভবত আমরা খুব কমজনই রাখি!

আজ সেই চুনীবালা দেবীর কিছু অজানা খবর নিয়ে আজ আপনাদের দরবারে পেশ

করতে এসেছি।

সত্যজিৎ রায় তখন পথের পাঁচালী সিনেমার হরিহর, সর্বজায়া, অপু, দুর্গা সব চরিত্রের অভিনেতা/অভিনেত্রী পেয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ইন্দির ঠাকরুন চরিত্রের অভিনেত্রীকে খুঁজে পাচ্ছেন না। মাথায় হাত। ওইরকম একজন বৃদ্ধা অভিনেত্রী না পেলে যে এ সিনেমা করাই যাবে না! অবশেষে সন্ধান মিলল ঠাকরুনের। পাইকপাড়ায় থাকেন এক বৃদ্ধা। বয়স আশি। নাম তাঁর চুনীবালা দেবী।

এক সকালে সত্যজিৎ রায় হাজির হলেন চুনীবালা দেবীর বস্তির বাড়িতে। তিনি একটা মোড়ায় মুখোমুখি বসলেন চুনীবালার সামনে।

এর অনেকদিন আগে একটি সিনেমার ছোট্ট দৃশ্যে অভিনয় করেছিলেন চুনীবালা।

সত্যজিৎ রায় এক জায়গায় বলেছেন,'...তখন চুনীবালা দেবীর বয়স আশি পেরিয়ে গেছে। তোবড়ানো গাল, দেহের চামড়া ঝুলে পড়েছে। ঠিক যেমনটি সত্যজিৎ ভেবেছিলেন এই চরিত্রটিকে ঠিক তেমনি। কথায় কথায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি পথের পাঁচালী পড়েছেন'? বৃদ্ধা চুনীবালা অল্প লেখাপড়া শিখেছিলেন। কিছু বইও পড়েছিলেন। চুনীবালা বললেন, 'হ্যাঁ পড়েছি বাবা'।

-'সিনেমায় ইন্দির ঠাকরুন করতে পারবেন'?

চুনীবালা ফোকলা দাঁত বার করে হেসে বললেন, 'তা তোমরা একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে পারবো বই কি বাবা'!

সত্যজিৎ বললেন, 'বলুন তো একটা ছড়া? শুনি একটু'।

চুনীবালা ঘুম পাড়ানির মাসিপিসি, পুরো ছড়াটা গড়গড় করে সুন্দর করে বলে দিলেন।

সত্যজিৎ পরে এক জায়গায় বলেছেন, 'ওই ছড়াটা আমি চার লাইনের বেশি বলতে পারতাম না। কিন্তু উনি সবটা বলে দিলেন'। এই বয়সে আশ্চর্য স্মৃতি দেখে সত্যজিৎ রায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন! তিনি বুঝে গেলেন ইন্দির ঠাকরুন পেয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু কলকাতা থেকে বড়াল গ্রামে প্রতিদিন শুটিংয়ে যাবার ধকল এই বয়সে নিতে পারবেন কিনা জিজ্ঞাসা করাতে চুনীবালা বললেন, 'খুব পারবো। তোমরা এত কষ্ট করে বই করছ, ওটুকু কষ্ট আমি ঠিক করতে পারবো'।

ওঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, প্রতিদিন কত টাকা পারিশ্রমিক নেবেন। উনি বলেছিলেন, 'দিনে দশ টাকা দিও'। সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, 'আপনাকে প্রতিদিন কুড়ি টাকা দেওয়া হবে'। শুটিং এগিয়ে চলল। প্রতিদিন সকালবেলায় ট্যাক্সি করে চুনীবালাকে শুটিং স্পটে নিয়ে যাওয়া হত। সন্ধ্যেবেলায় আবার ট্যাক্সি করে ফিরিয়ে দেওয়া হত বাড়িতে।

সত্যজিৎ রায় একদিন চুনীবালাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ধর্মমূলক গান গাইতে পারবেন'? চুনীবালা বললেন, 'পারবো'।

পথের পাঁচালীতে চুনীবালা চাঁদনি রাতে দাওয়ায় বসে হাততালি দিয়ে গাইছেন সেই গান, 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো, পার করো আমারে...'।

এই গানটা চুনীবালা সত্যজিৎ রায়কে শুনিয়েছিলেন। সেই খালি গলায় গান শুনে পরিচালক মুগ্ধ! সেই গানই রেকর্ড করা হল। ছবিতে খালি গলায় সেই গানই গাইলেন চুনীবালা। এক অসম্ভব সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে সেই গান পথের পাঁচালী ছবিকে এক অন্য জগতে পৌঁছে দিল।

পথের পাঁচালী সিনেমা ১৯৫২ সালে এক শরৎকালে কাশ ফুল আর রেলগাড়ির দৃশ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল; শেষ হতে সময় নিয়েছিল তিন বছর। ১৯৫৫ সালে ২৬ আগস্ট পথের পাঁচালী মুক্তি পেয়েছিল। সেই বছরেই নিউইয়র্কেই এই ছবি প্রথম মুক্তি পেয়েছিল। সত্যজিৎ রায় বুঝেছিলেন, এই ছবির মুক্তি চুনীবালা দেবী দেখে যেতে পারবেন না। তাই একদিন প্রজেক্টার মেশিন নিয়ে সত্যজিৎ রায় এই সিনেমা চুনীবালাকে তাঁর বাড়িতে দেখিয়ে এসেছিলেন। চুনীবালা পথের পাঁচালী ছবি বাড়িতে বসেই দেখে গিয়েছিলেন, মুক্তির আগে মহান হৃদয় সত্যজিৎ রায়ের উদ্যোগে।

ছবির মুক্তি চুনীবালা দেখে যেতে পারেননি তার আগেই 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্য হল পার করো আমারে...', গাইতে গাইতে চলে গেলেন!

এবার আসল চমক এল! ম্যানিলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আন্তর্জাতিক সম্মানের পুরস্কারে সম্মানিত অভিনেত্রীর নাম ঘোষিত হল।

চুনীবালা দেবী হলেন, ভারতীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মধ্যে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিতা অভিনেত্রী! এক বিরল সম্মানের অধিকারিনী।

অনেকেই সম্ভবত এই খবর জানেন না।

কিন্তু এই পুরস্কার তিনি গ্রহণ করতে ম্যানিলায় যেতে পারেননি কারণ তার আগেই তিনি বিদায় নিয়েছিলেন।

চুনীবালা বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স ১৫০ বছর হত।

তাই আজ এই বিশেষ স্মরণ।

দুর্ভাগ্য চুনীবালার! দুর্ভাগ্য বাঙালির!

ইন্দির ঠাকরুন 'চুনীবালা'র প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধা।

রবীন্দ্রনাথের একলব্য হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

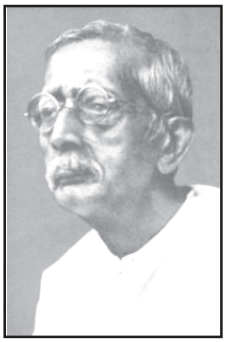

রবীন্দ্রনাথকে তিনি গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন বাংলা ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট অভিধান 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'। দুটি চোখের দৃষ্টি হারিয়ে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, ততদিনে তাঁর জীবন থেকে হারিয়েছে তিরিশটা বসন্ত।

তিনি হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় শব্দকোষ তাঁকে অমর করেছে। বাংলা ভাষার জন্য রচনা করে গিয়েছেন এক অমূল্য সম্পদ।

হরিচরণকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমাদের বাংলা ভাষায় কোনও অভিধান নেই, তোমাকে একখানি অভিধান লিখতে হবে'। শব্দ আর তার অর্থের সন্ধান খুঁজতে তারপর থেকে

হরিচরণের জীবনে দিন-রাত সব এক হয়ে যায়। প্রায় কুড়ি বছরের নিরলস পরিশ্রমে পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন। জীবনে অনেক কিছু হারালেও সেসবে তাঁর বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না, বরং তিনি

বলতেন, 'গুরুদেবের নির্দিষ্ট কাজে চোখ দু'টো উৎসর্গ করতে পেরেছি, এটাই পরম সান্ত্বনা'। হরিচরণের প্রায় কুড়ি বছরের নিরলস পরিশ্রমে পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়। কিন্তু পরের দশটা বছর পাণ্ডুলিপি পড়ে রইল। ছাপার মুখ দেখল না, ততদিনে তিনি

দ্বিতীয়বার পুরো অভিধানটি সংশোধনের কাজ সেরে ফেলেছেন। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' রচনার থেকে গ্রন্থ আকারে প্রকাশের সময়ের মাঝের অংশের বেদনাবিধুর গল্প বোধহয় যেকোনও পাঠকের চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় নেমে আসবে বারিধারা। অভিধান রচনা করতে গিয়ে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হারিয়েছেন দু'চোখের দৃষ্টি, বই প্রকাশ করার সময় অর্থাভাবে সব দিকের দরজা যখন বন্ধ হওয়ার উপক্রম, তখন জীবনের সব সঞ্চয় উজাড় করে দিয়েছেন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কুলের বেতন দেওয়ার সামর্থ্য নেই। তখন তিন টাকা বেতন মেট্রোপলিটন

ইনস্টিটিউশনে। কিন্তু সেই টাকা কীভাবে জোগাড় হবে! এক বন্ধু বলেছিল, পটলডাঙার মল্লিকবাবুরা কয়েকজন ছাত্রের বেতন দেন। দরখাস্তের সঙ্গে দু'টি সুপারিশপত্র ছিল। বিখ্যাত চিকিৎসক চন্দ্রমোহন ঘোষের সুপারিশ খারিজ করে দিয়েছিলেন জাঁদরেল মানুষ, ইন্ডিয়ান মিরর'এর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন। কিন্তু তাঁর

জন্য দ্বিতীয় সুপারিশপত্রটি যিনি পাঠিয়েছিলেন তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর সমস্যায় পড়তে হয়নি।

হরিচরণ-কবিগুরুর এমন স্নেহের সম্পর্কের আসল অনুঘটক হলেন পিসতুতো দাদা যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়। দাদা খবর দিলেন বাবুদের বাড়িতে নাটক হবে। 'বাল্মীকি প্রতিভা'। অভিনয় করবেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই নাটক দেখার জন্য যদুনাথের কিশোর ভাইয়ের মনে যেমন প্রবল উত্তেজনা, তেমন অনির্বচনীয় আনন্দ।

সেই নাটক তিনি দেখেছিলেন। প্রবীণ বয়সেও দস্যুবেশী রবীন্দ্রনাথের ছবি, নাটক দেখার স্মৃতি জীবনের মণিকোঠায় জ্বলজ্বল করত।

আচমকা শান্তিনিকেতন থেকে একটি বার্তা এসেছিল পতিসরের ম্যানেজার শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের কাছে। বার্তা পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে। আর কর্মচারী? তিনি হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন, 'দিনেরবেলা না হয় সেরাস্তায় কাজ করে, কিন্তু রাতের অবসরে সে কী করে'? কবির প্রশ্নের উত্তরে হরিচরণ বলেছিলেন, 'কিছুক্ষণ সংস্কৃতের আলোচনা করি ও কিছুক্ষণ একখানি বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে প্রেসের কপি প্রস্তুত করি'। কবি পাণ্ডুলিপি দেখতে চাইলেন। তার পরেই এসেছিল

শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বার্তা।

হরিচরণের পাণ্ডিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিল প্রবল আস্থা।

রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিপাঠীকে লিখলেন, 'এ গ্রন্থখানি রচিত ও প্রকাশিত হইলে দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইবে'। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, বিশ্বভারতী থেকেই প্রকাশ হবে ওই মহাগ্রন্থ। তিনি দায়িত্ব দিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে। কিন্তু বই ছাপার জন্য যে টাকার প্রয়োজন বিশ্বভারতীর তখন সেটার অভাব। সুনীতিকুমার শরণাপন্ন হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। কিন্তু সেখান থেকে বলা হল বই ছাপার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে। দুশ্চিন্তার গভীর মেঘ তখন যেন ছেয়ে আছে শান্তিনিকেতনে। অথচ হরিচরণ নাছোড়। বইপ্রকাশের আলোচনা হচ্ছে মাঝে-মাঝে, কে থাকছেন না, রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ থেকে

সুনীতিকুমার সবাই আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন কিন্তু সমাধানসূত্র অধরা।

হরিচরণ নিজের মতো করে চেষ্টা শুরু করলেন, তাঁর গুরুদেবের আদেশে তৈরি অভিধানকে যে প্রকাশের আলো দেখাতেই হবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে গিয়েও সমস্যার সুরাহা হল না। এরইমাঝে কেটে গেল দীর্ঘ প্রায় দশ বছর। এই সময় হরিচরণ দ্বিতীয়বার অভিধানটি সংশোধন করলেন। অবশেষে অভিধানের প্রকাশক পাওয়া গেল। 'বিশ্বকোষ'-এর নগেন্দ্রনাথ বসু বললেন, তিনি অভিধান প্রকাশ করবেন, কিন্তু শর্ত হল কাগজের দামটা তাঁকে মেটাতে হবে, ছাপার খরচ তিনি পরে নেবেন।

অভিধান প্রকাশের জন্য জীবনের সব সঞ্চয় ব্যয় করতে এতটুকু ভাবলেন না হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একে একে তেরো বছর ধরে প্রকাশিত হল মোট একশো পাঁচটি খণ্ড। হরিচরণের প্রয়াণের পর ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে দু'খণ্ডে গোটা অভিধানটি প্রকাশ করে সাহিত্য আকাদেমি। বাংলা ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট অভিধান; বঙ্গীয়

শব্দকোষ' এর রচয়িতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ভাষার জন্য রচনা করে গিয়েছেন এক অমূল্য সম্পদ। শুধুমাত্র 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' রচনার জন্য বাঙালি তাঁকে স্মরণ করবে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ। (সংগৃহীত)

বিনোদন—

বাবাকে নিয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় লেখেন 'অবনী বাড়ি আছো'

এই সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা অম্বরীশ ভট্টাচার্য। অভিনয় করেছেন মহাগুরু থেকে বিগ বি-র সঙ্গে। পাশাপাশি দারুণ গান করেন। আসর জমাতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। একান্ত আলাপচারিতায় খোলাখুলি মনের কথা জানালেন ***সৈকত হালদারকে।***

প্রশ্ন : পর্দা থেকে মঞ্চ সব ক্ষেত্রে সমান দক্ষতা। পছন্দের ক্ষেত্র কোনটা?

অম্বরীশ : থিয়েটার, সিনেমা, সিরিয়াল, ওয়েবসিরিজ, বিজ্ঞাপন সব মাধ্যমে কাজ করি। দেখতে দেখতে ১৭ বছর হয়ে গেল। যখন যেখানে কাজ করি একশো ভাগ দেওয়ার চেষ্টা করি। কাজটা এনজয় করি।

প্রশ্ন : ছোটোপর্দায় কীভাবে এলেন?

অম্বরীশ : গায়ক এখন অবশ্য মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের হাত ধরে আমার ছোটোপর্দায় আসা ২০০৭ সালে। ইন্দ্রনীল তখন সিরিয়ালের প্রযোজক। তাঁর নতুন সিরিয়ালের জন্য নতুন মুখ খুঁজছিলেন। একদিন দেবেশদার (দেবেশ চট্টোপাধ্যায়) নাটক দেখতে এসে আমার অভিনয় পছন্দ হয় ও দেবেশদার মাধ্যমে আমাকে ডেকে পাঠান। তখন আমার মনে হয়, আমার মতো মোটাসোটা ছেলেকে কি আর কোনো পার্ট দেবেন? নেহাৎ এক ছোটোখাটো অকিঞ্চিতকর পার্ট পাব। ভয়ে ভয়ে অডিশন দিতে যাই। সুযোগ পাই 'রাজা অ্যান্ড গজা' সিরিয়ালের গজার চরিত্রে। আমি গজা, গজেন্দ্র চৌধুরী, কেয়ার অফ পঞ্চানন চৌধুরী। এই সংলাপ খুব জনপ্রিয় হয়। এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি।

প্রশ্ন : এ পর্যন্ত অনেক সিরিয়ালে কাজ করেছেন। খড়কুটোর পটকা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে, তাই কি?

অম্বরীশ : খড়কুটো'র পটকা আমাকে দু'হাত ভরে দিয়েছে। জনপ্রিয়তা, খ্যাতি, দর্শকদের ভালোবাসা ও সরকারি সম্মান।

প্রশ্ন : পটকা এতটা হিট করবে আগে ভেবেছিলেন?

অম্বরীশ : শুরুতে না বুঝলেও দু' মাসের মধ্যে পটকা বুঝিয়ে দেয় সে দর্শকদের কাছে কতটা প্রিয়। এত ভালো চরিত্র আমি এর আগে পাইনি। একদিকে খুব সহজ সরল, আমুদে। অন্যদিকে তাঁর স্পষ্ট কথায় কষ্ট নেই। দু'য়ের মিশ্রণ ঘটায় এই চরিত্রে ভালো অভিনয়ের সুযোগ করে দেয়। এই চরিত্রে অনেকগুলো শেড আনেন লীনাদি (কাহিনিকার লীনা

গঙ্গোপাধ্যায়)। প্রথমদিকে কমিক রিলিফ হিসাবে চরিত্রটাকে আনা হয়। পরে লক্ষ্য করি লেখিকা এই চরিত্রকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। এই সিরিয়াল টানা দু' বছর চলে।

প্রশ্ন : এখন বাংলা সিরিয়াল নিয়ে অভিযোগ, গল্পে পরকীয়া, একজনের দু'টো বিয়ে, শাশুড়ি-বউয়ের অশান্তি দেখানো হয়। এসব সমাজের ক্ষতি করে? আপনার কী মত?

অম্বরীশ : মানুষের মধ্যে দ্বিচারিতা কাজ করে। মানুষ মনে যা চায়, তা পর্দায় দেখালে গেল গেল রব ওঠে। এখন বেশিরভাগ লোকের বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম সিরিয়াল। বাড়ির মা-মাসি-বোনেরা দেখেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শক যখন দেখেন তা খারাপ হতে পারে না।

প্রশ্ন : সিরিয়ালগুলো মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কেন?

অম্বরীশ : আমাদের পেশা সবসময় অনিশ্চিত। একটা সিরিয়াল বন্ধ হচ্ছে, তেমনি নতুন সিরিয়াল তো আসছে। আগে অনেকদিন ধরে একটা সিরিয়াল চলত। এখন বরং গল্প শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়াল শেষ হচ্ছে।

প্রশ্ন : আপনার প্রথম সিনেমা কোনটা?

অম্বরীশ : অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের 'ওপেন টি বায়োস্কোপ'।

প্রশ্ন : এপর্যন্ত অনেক নামি পরিচালকের ছবিতে অভিনয় করেছেন। কোন ছবিতে কাজ করে খুব খুশি হয়েছেন?

অম্বরীশ : আমি রবি কিনাগী, অঞ্জন দত্ত, সৃজিত মুখার্জি, কমলেশ্বর মুখার্জি, কৌশিক গাঙ্গুলি, বিরশা দাশগুপ্ত, শিবপ্রসাদ-নন্দিতা রায়ের মতো পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছি। প্রত্যেকের কাজের ধরন আলাদা। তবে কৌশিক গাঙ্গুলির 'কাবেরী অন্তর্ধান'এ নিখোঁজ কাবেরীর স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করে খুব তৃপ্তি পেয়েছি। সিনেমা মুক্তি পাওয়ার পর খুব প্রশংসা পাই। ওর পরিচালনায় 'লক্ষ্মী ছেলে'তে অভিনয় করেও ভালো লেগেছে।

প্রশ্ন : আপনি কোন কোন নায়কের সঙ্গে কাজ করেছেন?

অম্বরীশ : অনেকের সঙ্গে। তবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মিঠুন

মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে অম্বরিশ

অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে অম্বরিশ

চক্রবর্তী, অমিতাভ বচ্চন, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করে ধন্য হয়েছি।

প্রশ্ন : কার সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা কেমন?

অম্বরীশ : বুম্বাদা (প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়) যখন যে সিনেমায় কাজ করেন, নিজেকে 'নিউ কামার' ভাবেন। চরিত্রের সঙ্গে মিশে যান। একটা শট নেওয়ার পর জানতে চান ঠিক হয়েছে কিনা। সহশিল্পীদের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেন।

প্রশ্ন : বিগবি?

অম্বরীশ : বিগ বি'র সঙ্গে দু'বার কাজ করার সুযোগ হয়। ২০১৮ সালে প্রদীপ সরকারের একটা বিজ্ঞাপনে কাজ করার প্রস্তাব পাই। তাঁর সহকারী ফোন করে শুটের দিনক্ষণ ঠিক করে আমাকে জানান। কিন্তু সে দিন এক জরুরি কাজ থাকায় আমি শুটের তারিখ বদলানোর অনুরোধ জানাই। যদিও তাতে তাঁরা রাজি হননি। জানানো হয়, যিনি আমার সঙ্গে শুট করবেন, তাঁর পক্ষে ওই দিন বাদে আর সময় দেওয়া সম্ভব নয়। কথা শুনে কিছুটা অবাক হয়ে জানতে চাই, আমার সহঅভিনেতার নাম কী? জবাব আসে আমিতাভ বচ্চন। প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করতে কিছুটা সময় লাগে। আমি আর বিগবি একসঙ্গে পর্দায়? এটা কি সম্ভব? এসব ভাবতে ভাবতে সব কাজ বাতিল করে মুম্বই পাড়ি দিলাম। প্রথমে ওর বডি ডাবলের সঙ্গে মহড়া হয়। তারপর সেটে এলেন স্বয়ং বিগ বি। উনি নিজে কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে মহড়া দিলেন। যতবার তাঁর ভুল হয়েছে, উনি ততবার সরি বলেন। এত বড়ো তারকা হয়েও যে এমন অমায়িক হওয়া যায়, তা ওঁকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বিজ্ঞাপনের কাজ শেষ করে সাহস করে ওঁর কাছে এগিয়ে যাই। প্রথম প্রথম একটু ভয় করছিল। তারপর ভয় জয় করে শেষমেষ কথা বলি। তারপর শুরু হয় আমাদের আড্ডা। বিগবি কলকাতা নিয়ে অনেক গল্প করেন। ২০২২ সালে আরো একবার তাঁর সঙ্গে কাজের সুযোগ হয়। এবারো বিজ্ঞাপনের কাজ। ভেবেছিলাম উনি আমাকে চিনতে পারবেন না। এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই উনি আমায় থামিয়ে বলেন, আমি চিনতে পেরেছি। অমার কাছে সব কাজের গুরুত্ব সমান। যদি আমি কোনো কিছু ভুলে যাই, তবে বুঝতে হবে, আমার কাছে সেই জিনিসটার কোনো গুরুত্ব নেই। একদিন

সাহস করে বিগ বি-র মেকআপ ভ্যান দেখতে চেয়েছিলাম। উনি আমার কথায় রাজি হয়ে যান। সেখানে বসে আমাদের গল্প হয়। ওর নতুন আইফোন ব্যবহার করে আমাকে দেখান। একজন প্রকৃতশিল্পী বোধহয় এমনই হয়।

প্রশ্ন : মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা একটু শোনান...

অন্বরীশ : 'প্রজাপতি' সিনেমায় আমি মিঠুনদার জামাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করি। সেটে 'শ্বশুরমশাই'য়ের কড়া দাওয়াই ছিল- 'পাঁঠার মাংস একদম খাবি না। হজম হতে সময় নেয়। খুব ভারী। তোকে আরো ভারী করে দিচ্ছে। তারপর মহাগুরুর পরামর্শ ছিল- রোজ তেঁতুলজল খা। এতে বাড়তি মেদ চটপট ঝরে যায়। তুই আরামসে অনেকটা ঝরে যাবি'। বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিলাম। পাশাপাশি রোজ শুট শেষে একটাই তাঁর কথা ছিল- 'কী ভালো অভিনয় করিস! তুই সেটে থাকলে আমার খুব ভয় করে।' মিঠুনদার মুখ থেকে এই প্রশংসা আমার অনেক বড়ো পাওনা।

প্রশ্ন : আপনাকে পর্দায় বেশিরভাগ সময় পার্শ্ব চরিত্রে দেখা যায়। নায়ক হতে না পারার জন্য দুঃখ হয় না?

অন্বরীশ : এখন আমার যা বয়স সেখানে দাদা বা কাকার চরিত্রেই মানাবে। আর একটু বয়স হলে বাবার চরিত্রে ডাক পাব। তার জন্য আমার কোনো ক্ষোভ নেই। তাছাড়া নিজেকে কখনো প্রতিভাবান অভিনেতা ভাবি না। যা পেয়েছি ও পাচ্ছি তা নিয়েই খুশি থাকতে চাই। এই সময়ে প্রতিভাবান অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য, ঋষিক চক্রবর্তী, ঋদ্ধি সেনরা তো রয়েছে।

প্রশ্ন : কাজের জন্য আপনি সরকারি স্বীকৃতি ও সম্মান পেয়েছেন। কোন চরিত্রের জন্য?

অন্বরীশ : খড়কুটো সিরিয়ালের পটকা চরিত্রে অভিনয়ের জন্য রাজ্য সরকারের টেলি আকাদেমি পুরস্কার পাই। মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই পুরস্কার আমার হাতে তুলে দেন। এই পুরস্কার পেয়ে খুব খুশি হয়েছি।

প্রশ্ন : শুনেছি কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় আপনার বাবাকে নিয়ে 'অবনী বাড়ি আছো' কবিতা লেখেন?

অন্বরীশ : আমার বাবার নাম ছিল অবনী ভট্টাচার্য। সরকারি উচ্চপদে চাকরি করতেন। ছিলেন খুব সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ। সেই সূত্রে খুব ছোটোবেলা থেকে আমাদের বাড়িতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গাঙ্গুলি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল গাঙ্গুলি, গৌতম ঘোষকে দেখেছি। এরা বাবার ভালো বন্ধু ছিলেন। তা ওই কবিতা নিয়ে আমার বন্ধুরাও আমাকে প্রশ্ন করত, কবিতাটা সত্যি আমার বাবাকে নিয়ে লেখা কিনা। একদিন আমাদের বাড়িতে শক্তি চট্টোপাধ্যায় আসতেই কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে সোজা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাছে জানতে চাই, অবনী বাড়ি আছো-র অবনী কি সত্যিই আমার বাবা? প্রশ্ন শুনে খুব হেসেছিলেন। উনি আমাকে পালটা প্রশ্ন করেন, 'তোর কী মনে হয়? অবনী কে'? আমি তখন সবে বড়ো হচ্ছি। বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলি- 'এই যে তুমি অবনী বাড়ি আছো বলে চেঁচাতে চেঁচাতে আমাদের বাড়ি আসো, তাতে মন ভালো হয়ে যায়। আমার কাছে অবনী তাই একজন মন ভালো করা মানুষ। তবে আলাদা আলাদা মানুষের কাছে এর আলাদা ইন্টারপ্রিটেশন। যেমন, কোনো বিপ্লবীর কাছে অবনী নিশ্চয় বিপ্লব, যে প্রেমিকা তার কাছে অবনী একজন প্রেমিক। কথাগুলো মন দিয়ে শুনে শক্তিকাকু বলেন, 'বাহ! তোর বয়সে তুই ভালো ভেবেছিস তো? তারপর আমার পীড়াপীড়িতে উনি বলেন, 'শোন, অবনী একটা প্রপার নাউন। এক কাল্পনিক চরিত্র হয়তো। কিন্তু অবনী বাড়ি আছো' এই কবিতায় যে অবনীর কথা ভেবে আমি লাইনটা লিখেছি সে তোর বাবাই। মাঝরাতে ফুটপাত যখন বদল হয়, রাধা সিনেমার নীচে দাঁড়িয়ে এভাবে আমি তোর বাবাকে ডাকতাম'।

জহরদার মতো সিরিয়াস পাঠক খুব কম দেখেছি

প্রবীর বসু, অভিনেতা ও নির্দেশক, শৈলিক নাট্য সংস্থা

জহরদা (জহর রায়) স্ত্রী, ছেলে-মেয়েকে নিয়ে থাকতেন আমাদের পাড়ায় কলেজ স্কোয়ারের রাধানাথ মল্লিক লেনে। কিন্তু সেখানে জায়গা কম থাকায় বেশিরভাগ সময় কাটাতেন উলটো দিকের ৭১/১ পটুয়াটোলা লেনে 'অমিয় নিবাস'য়ে। তিনতলার দুটো ঘর ছিল তাঁর আস্তানা। পাড়ার বাবলুদার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। বাবলুদার মাকে জহরদা খুব শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর সঙ্গে দেখা না করে বাইরে বেরোতেন না। দূর থেকে জহরদাকে দেখে প্রথমে খুব রাশভারী মানুষ মনে হয় কিন্তু তাঁর সঙ্গে মেশার পর দেখি 'মাটির মানুষ'। সিনেমায় বেশিরভাগ ছবিতে তাঁকে কৌতুক অভিনেতা হিসাবে দেখা গেলেও ব্যক্তিজীবনে ছিলেন খুব 'সিরিয়াস' প্রকৃতির মানুষ। অসম্ভব পড়ুয়া ছিলেন। 'অমিয় নিবাস' শুধু তাঁর অফিস ছিল না, ছিল তাঁর লাইব্রেরিও। আলমারি ঠাসা অসংখ্য ইংরেজি-বাংলা বই ছিল। না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আলমারি ঘেরা মেঝেতে বিছানা পাতা, তাতে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে বই পড়তেন জহরদা।

জহরদার নিজের বাড়িতে কারোর যাওয়ার অনুমতি ছিল না, একমাত্র ভানুদা (ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়) যেতেন। অন্য সবার সঙ্গে এই মেস বাড়িতে দেখা করতেন। কথায় কথায় একদিন জহরদাকে বলেছিলাম, আপনি দক্ষিণ কলকাতায় উঠে গেলেন না কেন? তার উত্তরে জহরদা বলেন, 'ভেনো (ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়) সাউথ কলকাতায় থাকে। ও বাড়ি করেছে, গাড়ি কিনেছে, আমার আর কী দরকার'! ভানুদাকে এতটাই ভালোবাসতেন জহরদা। পাড়ার যে কোনো অনুষ্ঠানে শিল্পী দিয়ে সাহায্য করতেন। আমি নিজে যখন নাটকে এলাম খুব উৎসাহ দিতেন। কারণ জহরদা নিজেও ছিলেন নাটকপাগল মানুষ। তাঁর অভিনীত নাটকের মধ্যে রয়েছে 'সুবর্ণ গোলক', 'আমি মন্ত্রী হব'। রঙমহল থিয়েটার যখন বন্ধ হতে বসেছে, তখন রুখে দাঁড়ান জহরদা। শিল্পীদের নিয়ে দিনের পর দিন পথে বসেন। পরে সকলকে নিয়ে রঙমহল কার্যত তিনি চালান। তাঁর পরিচালনায় নীহাররঞ্জন গুপ্তর লেখা 'উল্কা' রঙমহলে অনেকদিন হয়।

ছোট্ট একটা ঘটনা বলি। একসময়ে আমি এ ই ই নামে এক ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থায় চাকরি করতাম। সেখানে তাঁকে একবার প্রধান অতিথি করে নিয়ে যাই। মঞ্চে উঠে সংস্থার নাম 'এ ডাবল ই স্কোয়ার' বলার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরা সবাই হাসিতে ফেটে পড়েন। ২০১৯ সালে জহর রায়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আমরা শৈলিক নাট্য সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁকে স্মরণ করার জন্য নানা পরিকল্পনা নিয়েছিলাম। কিন্তু অতিমারির জন্য পুরোটা বাস্তবায়িত করা যায়নি। ওই সময়ে চৌরঙ্গী পত্রিকার সাহায্যে 'শতবর্ষে জহর রায়' নামে এক বিশেষ সংখ্যা বের করি। সেখানে জহর রায়কে নিয়ে তাঁর কাছের মানুষরা কলম ধরেন। তাঁর অভিনীত 'আমি মন্ত্রী হব' নাটকটি শৈলিক নাট্য সংস্থা মঞ্চস্থ করে। দারুণ সাড়া পায়।

তবে একটাই দুঃখ, জহর রায়ের মতো প্রতিভাবান অভিনেতা যোগ্য মর্যাদা পেলেন না। বন্ধু সম্পর্কে বলতে গিয়ে একবার ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই দেশের কাছে সত্যিই জহর রায়ের কিছু পাওনা ছিল না? তিনি অন্য দেশে জন্মালে তো 'স্যার' উপাধি পেতেন'।

বাংলা সিরিয়ালে নায়িকারা রানি, পারিশ্রমিক মাসে লাখ টাকা

জনপ্রিয় বাংলা সিরিয়ালের নায়িকারা এখন বাংলার ঘরে ঘরে পরিচিত মুখ। তাদের নিয়ে দর্শকদের কৌতূহলের শেষ নেই। এই প্রতিবেদনে জানানো হল এইসময়ের টেলিসিরিয়ালে জনপ্রিয় নায়িকাদের পারিশ্রমিক।

জনপ্রিয় বাংলা সিরিয়ালের নায়িকারা এখন বাংলার ঘরে ঘরে পরিচিত মুখ। তাঁদেরকে সবাই চরিত্রের নামে চেনে। পুজোর মণ্ডপ থেকে বুটিকের ওপেনিং সবেতেই তাঁদের ডাক পড়ে। সে তুলনায় অবশ্য টেলি সিরিয়ালের নায়করা কিছুটা ব্যাকফুটে। শুধু জনপ্রিয়তা নয়, নায়িকাদের পারিশ্রমিকও আকাশছোঁয়া। এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হল এই মুহূর্তে জি বাংলার জনপ্রিয় সিরিয়ালের ১০জন নায়িকার পারিশ্রমিকের হিসেব।

বাংলা সিরিয়ালে মাসিক ভিত্তিতে টাকা দেওয়া হয়। শেষ থেকে শুরু করা যাক। 'ফুলকি' সিরিয়ালের হাত ধরে টেলি দুনিয়ায় প্রবেশ দিব্যানী মণ্ডলের। এখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাত্রী। প্রথম সিরিয়ালেই বাজিমাত। ফুলকির মাসিক পারিশ্রমিক ১ লাখ ১২ হাজার টাকা। এরপর রয়েছেন অরুণিমা হালদার। যাকে এখন 'মন দিতে চাই' সিরিয়ালে তিতলীর চরিত্রে দেখা যাচ্ছে। অরুণিমার পারিশ্রমিক মাসে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। পরের ধাপে

রয়েছে 'ইচ্ছে পুতুল' সিরিয়ালের মেঘ, তাঁর পারিশ্রমিক মাসে ১ লাখ ২৪ হাজার টাকা। 'গৌরী এল'-র নায়িকা মোহনার পারিশ্রমিক মাসে ১ লাখ ১৫ হাজার টাকা। মোহনা এখন একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। 'মুকুট' সিরিয়ালের (সদ্য বন্ধ হয়েছে) নায়িকা শ্রাবণী ভূঁঞ্যা পেতেন মাসে ১ লাখ ৩২ হাজার টাকা। 'রাঙা বউ'-র পাখি ওরফে শ্রুতি দাস পান মাসে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা। বাংলা সিরিয়ালের 'বেলট মাসি' নামে পরিচিত 'খেলনা বাড়ি'-র মিতুল পান মাসে ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা।

আগে ছিলেন 'জবা' এখন সবার কাছে পরিচিত 'পর্ণা' নামে। 'নিম ফুলের মধু' সিরিয়ালের পর্ণার পারিশ্রমিক মাসে ২ লাখ ২২ হাজার টাকা। বাংলা টেলি দুনিয়ার প্রথম সারির অভিনেত্রীদের একজন মানালি দে। তাঁকে এখন 'কার কাছে কই মনের কথা' সিরিয়ালে লিড রোলে দেখা যাচ্ছে। মানালির পারিশ্রমিক মাসে ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা। জি বাংলার সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পান ২১ বছরের অঙ্কিতা মল্লিক। 'জগদ্ধাত্রী' সিরিয়ালের হাত ধরে টেলি দুনিয়ায় ডেবিউ করেছেন তিনি। সেই জ্যাস সান্যালের পারিশ্রমিক মাসে ২ লাখ ৮৫ হাজার টাকা।

রূপচর্চা—

নিজেকে সুন্দর রাখাটা জরুরি শুধু নিজের জন্যই

জুন মালিয়ার সৌন্দর্য আজও যে কোনো অষ্টাদশীকে টেক্কা দিতে পারে। গ্ল্যামার-কুইন জুন একদিকে যেমন ২ সন্তানের মা অন্যদিকে, গৃহিণী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও অভিনেত্রী। বাড়ি, সংসার, কাজ, রাজনীতির সব ইকুয়েশন সামলেও নিজেকে এখনো আকর্ষণীয় করে রেখেছেন। আপনি কীভাবে নিজের সৌন্দর্য বজায় রাখবেন তারই হদিশ দিলেন অভিনেত্রী বিধায়ক জুন মালিয়া।

আমি সৌন্দর্যকে বরাবরই মনের আয়নায় দেখতে ভালোবাসি। দৈহিক সৌন্দর্য ও মনের সৌন্দর্য আমার কাছে সমানুপাতে চলে। তাই সৌন্দর্য রক্ষায় আমি দুটোর প্রতিই সজাগ। সমান যত্নবান। সুন্দর থাকার টিপস দিতে বসে আপনাদের একটা কথাই বলব, সুন্দর থাকুন শরীরে আর তরতাজা থাকুন মনে। জীবনের যাবতীয় জটিলতা, সংসারের হাজারো সমস্যা, অফিসের অত্যাধিক চাপ যতই নাজেহাল করুক, দৈনন্দিন মালিন্য যাতে মনে চেপে না বসে তার জন্য সবসময় চেষ্টা করুন। রূপচর্চার কথা বলতে বসে কেন আমি মনের কথা বলছি তা অনেকেই ভাবতে পারেন। তার প্রধান কারণ, 'মন' ভালো না থাকলে নিজেকে সুন্দর রাখার ভাবনাটা কে ভাববে?

দৈহিক সৌন্দর্য রক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে যে কথাটা আসে তা হল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত আগে পরিষ্কার রাখতে হবে, তারপর পরিচর্যা। গৃহবধূ থেকে কর্মরতা মহিলা এমনকী পড়ুয়াদের জন্য এই কথাটা প্রযোজ্য। পরিষ্কার থাকার প্রাথমিক উপায় হল সুন্দর করে স্নান। আমাদের দেশের প্রাকৃতিক আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র শীতকাল ছাড়া দিনে ২ বার স্নান জরুরি। বাড়িতে থাকলেও সারাদিনের কাজে-কর্মে যে ক্লান্তিবোধ তৈরি হয়, তা কেটে যায় বিকেলে বা সন্ধ্যায় স্নান করলে। নিয়মিত সাবান মাখাও জরুরি। চেষ্টা করতে হবে ন্যাচারাল সাবান বা ভেষজ সাবান ব্যবহার করতে হবে। গ্লিসারিন সাবান বা নিমতেলযুক্ত সাবান ভালো। একই

কথা প্রযোজ্য শ্যাম্পু বাছার ক্ষেত্রেও। প্রাকৃতিক উপাদানের পরিমাণ যেসব শ্যাম্পুতে বেশি রয়েছে, সেসব ব্যবহার করা ভালো। স্নানের সময় বালতিতে কয়েক ফোঁটা গোলাপ জল মিশিয়ে নিলে খুব তরতাজা লাগে। এখন রোজ ওয়াটার স্প্রে পাওয়া যায়।

বাহুসন্ধি পরিষ্কার রাখাটাও খুব জরুরি। আমাদের আবহাওয়ায় ঘাম হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আর বাহুসন্ধি যদি নিয়মিত পরিষ্কার না করা হয় অবধারিত ব্যাকটেরিয়া হয় ও তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াবে। তাই ওয়াক্সিং করে বা শেভিং করে অথবা হেয়ার রিমুভার দিয়ে নিয়মিত বাহুমূল পরিচ্ছন্ন করা দরকার। বডি স্প্রে বা পাউডারও ব্যবহার করতে পারেন। পাউডার ব্যবহারের সময় একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে-পাউডার লাগানোর পর বাড়তি পাউডার ঝেড়ে ফেলা দরকার। না হলে ঘামের সঙ্গে মিশে বিশ্রি একটা চটচটে অনুভূতি তৈরি হয়।

অনেকের স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশি ঘাম হয়। তাঁদের উচিত সুতির পোশাক ব্যবহার করা। এতে অনেক আরাম পাওয়া যায়।

একইরকম জরুরি পায়ের পাতা পরিষ্কার রাখা। অনেকের জুতো বা মোজায় গন্ধ হয়। এক্ষেত্রে নিমপাতা ভেজানো জল দিয়ে রোজ পা ধুয়ে নিলে ভালো। নিমপাতা জলে ভিজিয়ে রেখে সেই জল দু'দিন ধরে ব্যবহার করা যায়। মোজায় পাউডার দিয়ে মোজা পরলে গন্ধ এড়ানো যায়। একই সঙ্গে পায়ের নখও পরিষ্কার রাখতে হবে।

নিজেকে সুন্দর রাখার জন্য নিজেকেই সচেষ্ট হতে হবে। শুধু স্বামীর জন্য, প্রেমিকের জন্য বা অন্য কারোর কাছে বাহবা পাওয়ার জন্য নয়, নিজের জন্য সুন্দর থাকাটা জরুরি। আর তাই বেসিক একটা রুটিন মেনে চলতে হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পরের ধাপ হল পরিচর্যা। স্নানের পর ময়শ্চারাইজার ব্যবহার বা রাতে শোওয়ার আগে নাইট ক্রিম ব্যবহার করা দরকার। বিশেষ করে ঘুমোনোর সময় আমাদের পেশিগুলো অনেক রিল্যাক্সড থাকে, তখন ক্রিমের ব্যবহার অনেক কার্যকরী হয়। ক্রিম মেখে, অল্প ম্যাসাজ করে, বাড়তি ক্রিম টিস্যু দিয়ে শুষে নেবেন। চুলে তেল মাখা খুব প্রয়োজন। বাজার চলতি হাজার রকম তেলের ফাঁদে পা না দিয়ে চিরকাল নারকেল তেলের প্রতি একনিষ্ঠ থাকাই সবচেয়ে ভালো। অন্তত চুলের জন্য আমি তাই ব্যবহার করি। তবে যেটা মনে রাখতে হবে তেল মেখে বাইরে বেরোনো একেবারে নয়। তাতে বাইরের যাবতীয় ময়লা চুলে আরো চেপে বসে। তেল মেখে খানিকক্ষণ রেখে শ্যাম্পু করে ফেলুন। রোজ সম্ভব না হলে সপ্তাহে অন্তত ৩দিন। আর শ্যাম্পুর পর ব্যবহার করুন কন্ডিশনার। বাড়িতে সময় পেলে রিঠা, আমলা বা চায়ের পাতার জল যদি ব্যবহার করতে পারেন তার কোনো বিকল্প হয় না। কন্ডিশনার হিসাবে এগুলো ভালো।

নিয়মিত পরিচর্যার পর যেটা আসে তা হল সাজগোজ। পছন্দমতো সাজ যতই সাজুন, একটা ব্যাপারে সতর্ক করে দিই, পার্টি বা বিয়েবাড়িতে মেকআপ করে যাওয়ার পর ফিরতে যত রাতই হোক না কেন, মেকআপ না তুলে ঘুমোতে যাবেন না। তা না হলে দশ বছর বয়স এক রাতে বেড়ে যাবে। সামান্য পাউডার থাকলে, সেটাও তুলে ফেলতে হবে। সবকিছুর ওপরে নিজেকে সবসময় চাপমুক্ত রাখতে হবে। কোনোকিছু নিয়ে অহেতুক টেনশন করে মনের বয়স বাড়িয়ে ফেলবেন না। জীবনকে সহজভাবে নিতে হবে- তবেই সুন্দর থাকবেন।

ভালো থাকার টিপস—

আমার কাছে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ

সোহা আলি খান, বলিউড অভিনেত্রী

একজন মা ও স্ত্রী হিসাবে, নিজের পরিবারের যত্ন নেওয়াটা আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একটা সুস্থ ও সুখী পরিবার বজায় রাখার জন্য নিজের যত্ন নেওয়াটাও একইভাবে জরুরি। তাই আমি সবসময় আমার ও পরিবারের ক্ষেত্রে সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করি।

প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, আমি সবসময় স্বাস্থ্যকর খাবার খাই। রোজ বিভিন্ন তাজা ফল, শাকসবজি, চর্বিহীন প্রোটিন ও শস্যভরা খাবার খাই। তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জল পান করি। এটা শুধুমাত্র আমার শরীরকে ভালো রাখে না, পাশাপাশি আমার মেয়ের জন্য স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার একটা অভ্যাসও তৈরি করে। স্বাস্থ্যকর ও সুষম খাবার খাওয়ার অভ্যাস বজায় রাখার জন্য মননশীল স্ন্যাকিং ও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। যখন স্ন্যাকিংয়ের কথা আসে, আমি এমন সব বিকল্প খাবার বেছে নিই যা পুষ্টিকর ও একইসঙ্গে উপাদেয়। এই সব খাবারের মধ্যে আমার একটা প্রিয় খাবার হল বাদাম। বাদামে থাকা প্রোটিন ও ফ্যাটের একটা বড়ো উৎস, যা আমাকে সারাদিন ফুল এনার্জি দিতে সাহায্য করে। বাদাম হল বহুমুখী স্ন্যাকস, যা একাই বা দই বা ফলের মতো অন্যান্য স্ন্যাকসে যোগ করেও খাওয়া যায়। এক মুঠো বাদাম শুধু আমার ক্ষিদে মেটায় না বরং এটি একটা পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাবারের বিকল্প।

স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার পাশাপাশি শারীরিক কসরতকে খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমার বাচ্চাকে বাইরে হাঁটতে বা পার্কে খেলার জন্য নিয়ে যাই। নিজের ব্যায়ামের জন্যও সময় বের করি। তা সে যোগা ক্লাসই হোক বা জিম সেশন বা জগিং করতে যাওয়া। আমি মনে করি, ব্যায়াম আমাকে চাপমুক্ত রাখতে ও এনার্জি বাড়াতে সাহায্য করে। শারীরিক স্বাস্থ্যের মতো আমার ও পরিবারের কাছে মানসিক স্বাস্থ্যও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বিশ্রাম ও ধ্যানের জন্য সময় বের করি। সব সময়ে হাসি-খুশি থাকার চেষ্টা করি। কাজের বাইরে কোথায় আড্ডা মারা, পার্টিতে যাওয়া থেকেও দূরে থাকি। পরিবারের সঙ্গে বন্ডিং বজায় রাখতে এমন আরো বেশ কিছু কাজ করি।

নিবন্ধ—

জীবনের লক্ষ্য

আলপনা গঙ্গোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় প্রতিকূল অবস্থা চক্রের মধ্যে জীবের আত্মাস্বরূপ বিকাশেরই নাম জীবন। এই জীবনের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত সেই প্রসঙ্গে লেলিন বলেছেন, মানুষ একবারই জীবন পায়। মৃত্যুর আগে সে যেন বলতে পারে আমি আমার জীবন ব্যর্থ হতে দেয়নি, উৎসর্গ করেছিলাম মানবজাতির মুক্তির জন্য।

প্রত্যেকের জীবনেরই কোনও না কোনও লক্ষ্য আছে। নিরন্তর সাধনা দ্বারা প্রতিদিন সেই লক্ষ্যের নিকটবর্তী হতে হবে। কেননা, 'মানব জনম সার, এমন না পাবে আর'। সুতরাং এই জীবনকে সর্বোত্তমভাবে বিকশিত করে নিয়োজিত করাই জীবনের লক্ষ্য।

'জীবনের লক্ষ্য কী' হবে এই ধারণাটি শিশুর মনে আসে বিকাশ এবং অনুভূতির উন্মেষের সঙ্গে। তাই শৈশবকালে শিশু পরিবেশ থেকে এবং পরিবার থেকে যখন শিক্ষা গ্রহণ করে তখন অনুকরণীয় মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। বাল্যকালে শিশু ভাবে ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট, কবি অথবা গায়ক হবে। এই সম্বন্ধে তার ধারণাটি লক্ষ্য নয়, এটি উচ্চাশা। কিন্তু এই উচ্চাশা জীবনধারণের একটা অঙ্গ। সাধারণ মানুষ দিনযাপনের গ্লানিকে অস্বীকার করতে পারে না। তাই চিকিৎসা বা শিল্পকে সে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে সেই মুহূর্তে তার মনে হয়- "man cannot live by bread alone" অর্থাৎ অন্নবস্ত্রের সংস্থানই জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। মানুষের জন্য আত্মনিবেদন বা কল্যাণকর কাজের মাধ্যমে উৎসর্গ লাভ করাই জীবনের মূল লক্ষ্য।

মানুষ যখন যৌবনের প্রারম্ভে নানান মত এবং নানান প্রক্রিয়ার ভিড়ে দিশেহারা, কোন পথের দ্বারা তার জীবনের লক্ষ্য চরিত হবে তা নিয়ে সে যখন বিভ্রান্ত, তখন এক কবি তাকে সঠিক রাস্তার নির্দেশ দিয়েছেন----

'মহাজ্ঞানী, মহাজন যে পথে করে গমন
হয়েছেন চিরস্মরণীয়
সেই পথ লক্ষ্য করি শ্রীয় কীর্তির ধ্বজা ধরি
আমারও হবে বড়নিয়।'

তাই যৌবনের প্রারম্ভেই জীবনের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করে নিতে হবে। কারণ মহাপুরুষরা বলেন, লক্ষ্যবিহীন মানুষ হালবিহীন নৌকার সহিত তুলনীয়।

শোনা যায়, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের লক্ষ্য ছিল ভাগ্য দর্শন। সুভাষচন্দ্রের জীবনের লক্ষ্য ছিল, ভারতের স্বাধীনতা। জর্জ ওয়াশিংটনের লক্ষ্য ছিল, মানবজাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। ঋষি অরবিন্দের লক্ষ্য ছিল, জগতে দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠা করা। মাদার টেরেজার লক্ষ্য ছিল দরিদ্রের সেবা করা। জীবনের লক্ষ্য প্রসঙ্গে এই মহান ব্যক্তিদের কথা স্মরণ করার কারণ, মহান মানবের মহৎ চিন্তার আলোক ধারায় স্নাত হয়ে আমরা আমাদের জীবনের সঠিক লক্ষ্যটি স্থির করতে পারব।

তাই দেখা যাচ্ছে, যে প্রশ্ন জীবনের শুরুতে উচ্চারিত, "এ জীবন লইয়া আমি কি করিব", সেই প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে আত্মগত হতে চায়। পীড়িত মানুষ, মানুষের জন্য সহায়তাপূর্ণ সমাজ গড়তে চায়। মানবিক চৈতন্যের সঙ্গে সমাজ চৈতন্যের বিরোধ যে মানব চৈতন্যকে মুক্ত দেখতে চাই। এইজন্যই যখন যজ্ঞবলক মৈত্রীকে সকল পার্থিব সম্পদের উত্তরাধিকারিনী করতে চেয়েছিলেন তখন মৈত্রীর "যে না হং অমৃত সম তে নাহম কিং কুরজানো"। এ দ্বন্দ্ব শুধু তার জীবনে নয়, প্রত্যেক মানুষের জীবনে এসেছে, যে মানুষ মানবাত্মার সঙ্গে অন্তর আত্মার মিল আবিষ্কার করেছে।

সুতরাং জীবনের লক্ষ্য কি উপনিষদ, বুদ্ধ, খ্রিস্ট, সকলেই তা চেয়েছেন জীবনে অমৃতত্ত্ব অর্জন। এই অমৃত সাধনা মানুষের জীবনে শ্রেষ্ঠ সাধনা। মানুষের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলে মহান কল্যাণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নাম নির্বাণ। আর বহিরঙ্গ জীবনে আধিভৌতিক ঘটনা দৈবিক ঘটনা যা মানুষকে ভীত করে তা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যেই নিহিত আছে। অমৃতত্ত্বের সাধনা আর এই অমৃতত্ত্ব অর্জনের ধারণাটি পৃথিবীর নানা দেশে প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন উপায়ে পরীক্ষিত হয়ে বিরাজ করছে। যা সুদূর প্রাচ্যে যীশুখ্রীষ্টের অন্যতম জীবনের লক্ষ্য ঈশ্বর সন্ধার নামে অভিহিত হয়েছিল। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের ভাষায় মানুষের জীবনের লক্ষ্য ঈশ্বর দর্শন।

তাই মানুষ বিশ্বপিতার কাছে প্রার্থনা করছে

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পূর্ণ করো করো দহন দানে।

তাই এই এক জীবনে মনুষ্যত্বই আমাদের জীবনের লক্ষ্য এই হোক আমাদের ভাবনা।'

মোহনবাগানের প্রথম আইএফএ শিল্ড জয়ই স্বাধীনতার স্বাদ এনে দেয়

সৃঞ্জয় ঠাকুর

১৯১১ সালের খেলার মাঠে স্বদেশীরা (মোহনবাগান ক্লাব) যেভাবে ইংরেজদের পর্যদুস্ত করে জয় ছিনিয়ে নেন সেটাই ছিল পরাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথম জয়।

সাল ২০২১। আমি তখন ১১ বছরে পা দিয়েছি। কিছুই বুঝি না মোহনবাগান ক্লাব বা আইএফএ শিল্ড সম্বন্ধে। বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, হাজার হাজার ভারতবাসীর আত্মবলিদান, ইংরেজ শাসকদের পাশবিক অত্যাচার বুঝতে শিখি। ১৭৫৭ সালে কিছু অপদার্থ স্বার্থান্বেষী ভারতীয় কাপুরুষ ইংরেজ শাসকদের হাতে দেশের শাসনভার তুলে দেয়। আমার বিশ্লেষণে 'কিছু পেতে গেলে কিছু হারাতে হয়'। আমাদের আজকের ভারত হয়তো এতটা গর্বের হত না যদি না পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফর ইতিহাসে নিজের জায়গা করে নিতেন। যদি বলি, মীরজাফর পরোক্ষভাবে আজকের ভারতের ছবিটা তৈরি করেছেন যা তিনি নিজেও জানতেন না। আজকের ভারত যা বিশ্বের দরবারে উন্নয়নশীল দেশ বলে নিজেকে প্রমাণ করেছে সেটার জন্য আমাদের পুরোনো সংস্কার থেকে বেরিয়ে আসা একান্ত জরুরি ছিল।

ইংরেজদের শাসন যখন অত্যাচারে পরিণত হয় সেই ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা করে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রধান কারণ ছিল ইংরেজরা ভারতবাসীর আবেগ এবং কর্মবিমুখ সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানে। যাতে ভারতবাসী নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তবে ওইসময় দেশবাসী ইংরেজদের এই চক্রান্ত নষ্ট করে দেয়। সেই সময় ভারতবাসীরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

ইংরেজ শাসন থেকে ভারতমাতাকে মুক্ত করতে হবে। সেই জন্য দরকার সাহস এবং যে কোনওভাবে জয় ছিনিয়ে নেওয়া। ১৯১১ সালের খেলার মাঠে স্বদেশীরা (মোহনবাগান ক্লাব) যেভাবে ইংরেজদের পর্যদুস্ত করে জয় ছিনিয়ে নেন সেটাই ছিল পরাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথম জয়।

হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্ম এক হয়ে তাদের দেশের জন্য উন্মাদনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে প্রচুর মানুষ ৪০০-৫০০ কিলোমিটার দূরে থেকেও খেলা দেখতে আসে কলকাতায়।

ওই সময় কলকাতায় যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় দুর্বিষহ ছিল।

সেটা নিছক খেলা ছিল না ছিল-----

* স্বদেশী ও ইংরেজদের কার্যত যুদ্ধ
* স্বদেশী মানসিকতার উন্মাদনা প্রকাশ
* যুদ্ধ জয়ে ইংরেজদের হারানো
* ভবিষ্যৎ যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং কৌশল ঠিক করা।
* যুদ্ধে জেতার জন্য দরকার জেদ ও অসম্ভব দৃঢ়তা।

এই জয় আমাদের বলে দিয়েছিল, 'আমরা করব জয় নিশ্চয় একদিন'...

লিখতে গিয়ে দেখছি, ১১২ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষ বা যাঁরা দেশের মুক্তি আন্দোলনে মেতেছিলেন তাঁদের রক্তচাপ ঠিক কতটা ছিল সেটা বোঝা খুব কষ্টকর। কিন্তু এখন বলতে পারছি এই জয় আমাদের দেশের পথপ্রদর্শক। যুদ্ধের জয় যে অসম্ভব সাহস, পরিকল্পনা এবং কৌশলের দ্বারাই হয় সেটা ১১জন স্বদেশী প্রমাণ করেছিলেন। তাঁরা প্রমাণ করেছিলেন যে ইংরেজরা অপ্রতিরোধ্য নয়।

১৯১১ সাল ভারতীয় ফুটবলের এক অবিস্মরণীয় সময়কাল। খালি পা দিয়েই খেলে মোহনবাগান প্রথম আইএফএ শিল্ড জিতেছিল। এটা ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের ভূমিপুজো।

ভারতের প্রাচীনতম এই অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল ক্লাব মোহনবাগান ১৯১১ সালের ২৯ জুলাই ব্রিটিশ দল ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে ২-১ গোলে পরাজিত করে দেশকে নতুন দিশা দেখায়।

প্রথমবার কোনো ভারতীয় তথা এশিয়ান ক্লাব বিদেশি দলকে পরাজিত করে। কাজেই এই ঐতিহাসিক জয়টা ছিল বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। এ যেন এক সোনালি স্বপ্নের বিস্ময়কর আহ্বান। পুরো টুর্নামেন্টে মোহনবাগান সেন্ট জেভিয়ার্স (৩-০), রেঞ্জার্স (২-১) রাইফেল ব্রিগেড (১-০) এবং মিডলসেক্স রেজিমেন্ট (১-১, ৩-০) এর মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। মোহনবাগানের এই কৃতিত্ব সমস্ত বাঙালি যুবককে উজ্জীবিত করেছিল।

১৯১১ সালের ২৯ জুলাই শুধুমাত্র কোনও স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি হয়নি, বরং এটি এমন এক উপলক্ষ ছিল যা ভারতীয় ফুটবলকে নতুন দিগন্ত দেখিয়েছিল। ম্যাচটি দেখতে সুদূর পটনার পূর্ণিয়া, কিষাণগঞ্জ, অসম ও ঢাকা থেকে হাজার হাজার মানুষ খেলা দেখার জন্য ভিড় করে। টাইমস অফ ইন্ডিয়া এবং পাইওনিয়ার-এর মতো সংবাদপত্রগুলি বিশেষভাবে এই খেলার

প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

এই জয়ের স্বাদ ছিল একেবারেই আলাদা। ভারতবাসীর সমস্ত উচ্ছ্বাসের বাঁধ যেন ভেঙে পড়েছিল। মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের ঘোড়াচালিত গাড়িতে বসিয়ে মিছিল করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ১১২ বছর পরে সেই মুহূর্তটা এখনো ভারতীয় ফুটবলে গৌরবময়।

১৯১১ সালে মোহনবাগানের এই জয় শুধু মাঠে জেতাই নয়, একইসঙ্গে কোটি কোটি ভারতবাসীর কাছে এই বার্তা দেওয়া হয়েছিল, 'আমাদের অস্ত্র কম থাকতে পারে কিন্তু নিজের দেশ, নিজের মাকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে কোনও বাধাই আর বাধা নয়। এখন যুদ্ধ শুধু সময়ের অপেক্ষা'।

১৯১১ সালে ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্ট-এর বিরুদ্ধে মোহনবাগানের ম্যাচটি এশিয়ার অন্যতম সেরা ফুটবল ম্যাচছিল। যা ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহের সূচনা করেছিল।

১৮৮৯ সালের ১৫ আগস্ট যে ক্লাবটির জন্ম হয় সেটি মোহনবাগান ক্লাব। আর যাঁরা জন্ম দেন তাঁরা প্রত্যেকে স্বদেশী আন্দোলনের পথিকৃৎ।

এই সেই মোহনবাগান ক্লাব, যার যাত্রা শুরু হয় উত্তর কলকাতা থেকে। মোহনবাগান অঞ্চলের মিত্র ও সেন পরিবারের সাহায্যে ভূপেন্দ্রনাথ বসুর উদ্দীপনায় ১৮৮৯ সালের ১৫ আগস্ট মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়। এটাই প্রথম স্বদেশী ক্লাব। পরবর্তীতে দেশের স্বাধীনতা দিবসের সঙ্গে জাতীয় ক্লাবের ভবিষ্যৎ ভাবনা মিশে গেছে।

মোহনবাগান আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে হারিয়েছিল এমন একটি সময় যখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হচ্ছিল।

শৃঙ্খলাবাদী শৈলেন বসুর মতো প্রশিক্ষকের কাছ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাচীনতম ভারতীয় ফুটবল ক্লাবকে মর্যাদাপূর্ণ ভারতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আইএফএ শিল্ড খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

খালি পায়ে ১১ সদস্যের মোহনবাগান দলটি আরো ভালোভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে ইস্ট ইয়র্কশায়ার দলের মুখোমুখি হয়েছিল। কিন্তু কিছুই দলের খেলোয়াড়দের চেতনাকে বঞ্চিত করতে পারেনি। কারণ তাঁদের কাছে খেলায় জয় শুধু ফুটবল মাঠেই নয়, পুরো দেশের জন্য এক জাতীয় বিজয়। সহনশীলতা, উদ্যম আর দেশের জন্য আত্মত্যাগ তাঁদের মনে এক উচ্চাশা তৈরি করেছিল।

খেলার শুরুতে ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টের হয়ে সার্জেন্ট জ্যাকসন প্রথম গোলটি করেন।

ধীরে ধীরে মোহনবাগান খেলায় গতি আনে। মাঠে প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে করতে মুহূর্তেই গতিপথ পরিবর্তন করে অধিনায়ক শিবদাস ভাদুড়ি গোল করেন। ২দলের গোল তখন সমান হয়ে যায়। পরে অভিলাষ ঘোষ জয়সূচক গোলটি করে খেলার স্কোর করে দেয় ২-১। সে এক আলাদা উল্লাস! যুদ্ধে জেতা এক সৈনিক দল মোহনবাগান, ভারতবর্ষের অন্তরে সারা জীবনের মতো জায়গা করে নেয়।

সেই মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়দের মরণোত্তর 'মোহনবাগান রত্ন' দেওয়া হয়েছিল।

দলের দুর্দান্ত এই সাফল্যের স্মরণে বাংলার পরিচালক অরূপ রায় 'দ্য ইমমর্টাল ইলেভেন' নামে একটি চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন।

১৯১১ সালে মোহনবাগান আইএফএ শিল্ডের জন্য যে দলটি গঠন করে তার অধিনায়ক ছিলেন শিবদাস ভাদুড়ি। বাকিরা হলেন হীরালাল মুখার্জি, ভুটি সুকুল, সুধীর চ্যাটার্জি, মনমোহন মুখার্জি, রাজেন সেনগুপ্ত, নীলমাধব ভট্টাচার্য, কানু রায়, হাবুল সরকার, অভিলাষ ঘোষ, বিজয় দাস ভাদুড়ি।

হে বীর খেলোয়াড়, আপনারাই ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম কাণ্ডারি। আপনারা অমর হয়ে থাকবেন সকল ভারতবাসীর অন্তরে।

With Best Compliments from....

Geetanjali Solar

With Best Compliments from....

HAPPY
DURGA
PUJA

ALL WELL WISHER

S. SAHA

With Best Compliments from....

M/S Ramdeo Mishra

Labour Contractor,
Civil Contractor
Transporter
ADD : P.O - Marar- 829117,
Dist : Ramgarh (Jharkhand)

With Best Compliments from....

Debjani Rakshit

BEST COMPLIMENTS FROM

FIRST CITY SECURE TECHNOLOGIES LLP.
Nashik, Maharashtra

INSTITUTE OF SKILLS

Under Management Control of Manasi Research Foundation

ADMISSION OPEN

Limited Seat

Vocational Training Classes

"Do the Best"
"Exciting Careers"
2023

Guaranteed employment opportunity - based on capacity

All Faculties are Professional (CA, CMA,CS) and Expert in their fields

Our Courses :

1) SMART ACCOUNTANT
2) HOSPITALITY MANAGEMENT SERVICE
3) E-COMMERCE –BPO-KPO-LPO
4) OFFICE MANAGEMENT PROCEDURES
5) COMMUNICATION SKILLS

Contact Us

https://manasiresearch.org

manasimrf2014@gmail.com
instituteofskills2022@gmail.com

Build Your Capacity, Build your Career

7980272019 / 6291570050 / 9330847337

22/4 Verner Lane, Belgharia, Kolkata - 700056